বৈষম্যবিরোধী
ছাত্র গণ-আন্দোলন
চট্টগ্রাম বিভাগ

জুন ২০২৫ ■ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

বীর
চট্টলা

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুন ২০২৫ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩২

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা: চট্টগ্রাম বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ১লা মে ২০২৫ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৫' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা ফটোসেশনে অংশ নেন— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক চট্টগ্রামের ইতিহাসের মতো এর সংগ্রামী চেতনাও প্রাচীন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামবাসীর অতুলনীয় বীরত্ব, অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ, অনুপম সাহসিকতা এবং ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে (পঞ্চাশের মন্বন্তর) অসহায় মানুষের প্রতি চট্টগ্রামবাসীর উদার অবদানে মুগ্ধ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'চট্টগ্রাম: ১৯৪৩' শীর্ষক কবিতায় চট্টগ্রামকে 'বীর চট্টগ্রাম' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ব্রিটিশ-উত্তরকালেও পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধসহ সব অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের পুরোভাগে ছিল চট্টগ্রাম। স্বাধীন বাংলাদেশে অধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলনেও প্রোজ্জ্বল চট্টগ্রাম। এ অঞ্চল 'বীর চট্টলা' নামেও পরিচিত। অতীতের সব আন্দোলনের মতো জুলাইয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গর্জে উঠেছিল বীর চট্টলা।

ইতিহাস সাক্ষী, অতীতের প্রতিটি আন্দোলন সূচনা করে ছাত্ররা। এসব আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। ২০২৪-এর জুলাই আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ধীরে ধীরে রূপ নেয় গণ-আন্দোলনে। কোটা সংস্কারের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটি পর্যায়ক্রমে সরকার পতনের 'এক দফা' আন্দোলনে পরিণত হয়। কঠোর আন্দোলন আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিজয় হয় অকুতোভয় ছাত্র-জনতার।

উদ্দাম, দুর্বার, দুর্দম ও অনড় আন্দোলনকারীদের মতো বীর চট্টলার তরুণরাও আন্দোলনে ছিল আপোশহীন ও অকুতোভয়। চট্টগ্রাম বিভাগের সংগ্রামী অদম্য তরুণদের দুর্বার আন্দোলন আর গৌরবগাথা তুলে ধরবে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*। জুলাই আন্দোলনে চট্টগ্রাম বিষয়ে নিবন্ধসহ সংবাদ প্রতিবেদন রয়েছে আমাদের এবারের বিশেষ সংখ্যায়।

বৈষম্যহীন, আদর্শ, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্যইতো তরুণদের এ মহীয়ান আত্মত্যাগ। এ আন্দোলন তাই আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার এক অনন্য নজির। তারুণ্যের বলীয়ান শক্তি এখন দেশ গঠনে ব্রতী। আমরাও নিজ নিজ অবস্থান থেকে বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করব– এমন অঙ্গীকার হোক আমাদের সবার।

সচিত্র বাংলাদেশ জুন ২০২৫ সংখ্যা 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন: চট্টগ্রাম বিভাগ' নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

নিবন্ধ/সংবাদ প্রতিবেদন/শহিদ স্মরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
গর্জে ওঠে বীর চট্টলা ৪

তারুণ্যের শক্তি ও স্বপ্নের বিজয়গাথা ৬
খোরশেদ আলম নয়ন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ঘটনাপ্রবাহে কুমিল্লা ৮

কুবি শিক্ষার্থীদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ ১০

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ ১১

রক্তাক্ত জুলাই ও চট্টগ্রামে গ্রাফিতি বিপ্লব ১২
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন

সড়ক অবরোধ থেকে সরে গণসংযোগে চবি শিক্ষার্থীরা ১৭

শিক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জঃ
প্রতিবাদে আড়াই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ ১৮

মোমবাতি জ্বালিয়ে আন্দোলনে কুবি শিক্ষার্থীরা ২০

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ২১

বীর চট্টলার বীরত্বগাথা ২২
ড. শিল্পী ভদ্র

কোটা সংস্কার ও মামলা প্রত্যাহারের
দাবিতে চট্টগ্রামে গণপদযাত্রা ২৯

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক ও রেলপথ অবরোধ
আইআইইউসি শিক্ষার্থীদের ৩০

ফেনীতে মহাসড়ক অবরোধ করে
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ৩১

৯ দফা দাবিতে নোয়াখালীতে
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সমাবেশ ৩২

শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার ও 'গণহত্যার'
প্রতিবাদে চবি শিক্ষকদের মানববন্ধন ৩৩

প্রতিটা মেয়েই হয়ে উঠুক স্ফুলিঙ্গ ৩৫
রহিমা আক্তার মৌ

'সন্তান হত্যা'র বিচার দাবিতে
চট্টগ্রামে রাজপথে মায়েরা ৩৯

আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে
চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট মোড় ৪০

নগরে মানুষের বাঁধভাঙা উল্লাসঃ
রাস্তায় ছাত্র-জনতার ঢল, সব পথ
মিশেছিল কাজীর দেউড়িতে ৪১

গেজেট থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের শহিদদের তালিকা ৪৩

দিন পেরিয়ে রাতেও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে
চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা ৫৪

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের
প্রথম শহিদ ওয়াসিম আকরাম ৫৫

ট্রাফিক ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শিক্ষার্থীরা
নতুন বার্তা দিয়ে দেয়াল লিখন ৫৭

ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এক আলোকধারা ৫৮
জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

মাকে অপেক্ষায় রেখে চলে গেছেন ওমর ৬০

চট্টগ্রামের দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতি ৬১

জুলাই আন্দোলনে বীর কন্যা শহিদ নাঈমা সুলতানা ৬৩
মিয়াজান কবীর

এভাবে চলে যাবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি ৭২

গল্প

প্রথম কদমফুল ৬৬
রফিকুর রশীদ

শেষ থেকে শুরু ৭৩
আজহার মাহমুদ

কবিতাগুচ্ছ ৭৭-৭৯

আইউব সৈয়দ, আতিক রহমান, উম্মে সালমা,
মমতা মজুমদার, সুলতানা রাসু, কবির কাঞ্চন,
মুহিবুল হাসান রাফি, নাজমুল সায়েম

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন গবেষক মুস্তাফা জামান আব্বাসী ৮০

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গর্জে ওঠে বীর চট্টলা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গর্জে উঠেছিল বীর চট্টলা। জুনের শুরু থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন ধীরে ধীরে রূপ নেয় গণ-আন্দোলনে। পরে তা গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। পতন হয় জালিম ফ্যাসিস্ট সরকারের। অবসান হয় তার সাড়ে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের। এ আন্দোলনে শাহাদতবরণ করেছেন শত শত শিক্ষার্থী। আহত হয়েছিলেন হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। অনেকেই জীবনের তরে চোখ হারিয়েছেন। পঙ্গুত্ববরণ করেছেন কেউ কেউ। আন্দোলন দমনে সারাদেশের মতো চট্টগ্রামেও চলেছে ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডাবাহিনী ও আওয়ামী পুলিশের নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। নির্বিচারে গুলি, বোমা, টিয়ারশেলের মধ্যে বুক পেতে দিয়েছে অকুতোভয় ছাত্র-জনতা। চট্টগ্রামের মাটি বিপ্লবীদের রক্তে ভেজা। জুলাই বিপ্লবেও রক্তে ভিজেছে বীর চট্টলার মাটি। তবুও মাথা নত করেনি এখানকার বীর সন্তানরা। জালিমের অবসান না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ দখলে রেখেছে লড়াকু জনতা।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্যারেড ময়দান থেকে প্রথম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন হাবিলদার রজব আলী। মূলত তখন থেকেই আধিপত্যবাদী আর দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূচনা। সাতচল্লিশের পাকিস্তান আন্দোলন, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পুরোভাগে ছিল চট্টগ্রাম। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাও এ মাটি থেকেই। স্বাধীনতার ঘোষণাও আসে কালুরঘাটের ঐতিহাসিক বেতারকেন্দ্র থেকে। ভারতীয় নীলনকশায় ওয়ান-ইলেভেনের পর প্রহসনের নির্বাচনে ২০০৮-এ ক্ষমতা দখল করে ফ্যাসিস্ট সরকার। এরপর আধিপত্যবাদী ভারতের প্রত্যক্ষ মদদে দেশে কায়েম হয় মাফিয়াতন্ত্র। বিডিআর বিদ্রোহের নামে পিলখানায় দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী কর্মকর্তাদের হত্যা থেকে শুরু করে আধিপত্যবাদী বিরোধী কণ্ঠস্বরদের সাজানো বিচারে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো, নির্বিচারে গুম, খুন তথা ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম ছিল উচ্চকণ্ঠ। ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডাবাহিনী ও র‍্যাব-পুলিশের নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্যেও রাজপথের আন্দোলনে সক্রিয় ছিল চট্টগ্রামের মানুষ। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ইসলামি সংগঠন রাজপথে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। আন্দোলন দমাতে নিষ্ঠুরতম

ক্র্যাকডাউন চালানো হয়। হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গায়েবি মামলায় গ্রেপ্তার করে কারাপ্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ আর আওয়ামী ক্যাডারদের নির্বিচারে গুম, খুনের শিকার হন অগণিত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। বাড়িঘর ছাড়া হন হাজার হাজার নেতা-কর্মী সমর্থক।

এরপরও রাজপথ ছাড়েননি রাজনৈতিক কর্মীরা। প্রতিটি কর্মসূচি পালিত হয়েছে সফলভাবে। দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর রাজপথে গড়ে ওঠা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা। সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও রাজপথে নেমে আসে। তবে আওয়ামী ছাত্রলীগের দস্যুবাহিনীর কাছে জিম্মি থাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বদলে চট্টগ্রাম শহরে আন্দোলন শুরু করে ছাত্ররা। নগরীর ষোলশহর ২নং গেইট থেকে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে আন্দোলনে শরিক হন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। ধীরে ধীরে আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। শুরুতেই এ আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে তার দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শিক্ষার্থীদের দমনে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের মাঠে নামিয়ে দেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফ্যাসিস্ট সরকারের নিকৃষ্টতম দোসর মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের ক্যাডার বাহিনী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মাঠে নামে। পুলিশের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। প্রথম দিনেই শাহাদতবরণ করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম আকরামসহ তিনজন। গুলিবিদ্ধ হন অগণিত ছাত্র-জনতা। ফ্যাসিস্ট সরকারের খুনি বাহিনীর তাণ্ডবের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে পুরো চট্টগ্রাম। ছাত্রদের সাথে রাজপথে নেমে আসে সর্বস্তরের মানুষ। আন্দোলন মহানগর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে উপজেলা পর্যায়ে। রাজপথ, রেলপথ অবরোধসহ নানা কর্মসূচি দিয়ে মাঠে নামে ছাত্র-জনতা। আন্দোলন যত তীব্র হয় ফ্যাসিস্ট সরকারের রক্তপিপাসা ততই বেড়ে যায়। দলীয় ক্যাডার, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী খুনের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে। সবকিছু উপেক্ষা করে রাজপথের লড়াইয়ে শামিল হয় সর্বস্তরের মানুষ। রাজধানী ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে চলে ক্র্যাকডাউন। পুলিশবাহিনী দলীয় লাঠিয়ালের ভূমিকায় মাঠে নামে। গ্রেপ্তার করা হয় বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীসহ শত শত ছাত্র-জনতাকে। রিমান্ডের নামে চালানো হয় বর্বরতম নির্যাতন। হত্যাকাণ্ড আর ধরপাকড়ের পরও রাজপথে বাড়তে থাকে জনতার মিছিল। আগস্টের প্রথম দিন থেকে নগরীর প্রতিটি সভা-সমাবেশে লাখো মানুষের ঢল নামে। নিউ মার্কেট চত্বরে ইতিহাসের নজিরবিহীন বিশাল সমাবেশ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা। সেখান থেকে শুরু হয় সর্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলন। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের আলামত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তখনই মরণকামড় দেয় আওয়ামী দস্যু ও পুলিশবাহিনী। দমনপীড়নে আরও বেশি গর্জে ওঠে ছাত্র-জনতা। প্রতিরোধের মুখে একপর্যায়ে পিছু হটতে থাকে ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যরা। নিউ মার্কেট চত্বর ছাড়িয়ে জনতার প্রতিরোধ আন্দোলন মহানগরীর অলিগলি থেকে শুরু করে গ্রামপর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। ৩রা ও ৪ঠা আগস্ট চট্টগ্রাম ছিল আন্দোলনকারীদের দখলে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিরপেক্ষ ভূমিকায় ছিলেন শুরু থেকে। ৫ই আগস্ট আসে মহাবিজয়। ফ্যাসিস্ট সরকার প্রধানের তার প্রভুরাষ্ট্র ভারতে পালিয়ে যাওয়ার খবরে গোটা চট্টগ্রাম উল্লাসে ফেটে পড়ে। লাখো মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। নারী-পুরুষ-শিশু থেকে শুরু করে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এককাতারে শামিল হন। বিজয়ের উল্লাসে আনন্দ অশ্রুতে ভাসেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী জনতা। এক নতুন বাংলাদেশ পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়েন সবাই। জালিম ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার শুরু করা আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন এমন অভ্যুত্থানে আধিপত্যবাদী মদদপুষ্ট সরকারের অবসান হয়। অতীতের সব আন্দোলনের মতো জুলাই বিপ্লবে চট্টগ্রামবাসীর বীরত্বগাথা ২০২৪ সালের আলোচিত ঘটনা। আন্দোলন সংগ্রামের ঐতিহ্যের নগরী চট্টগ্রামের বীর জনতার এ আন্দোলন ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে।

[সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব, ১লা জানুয়ারি ২০২৫]

তারুণ্যের শক্তি ও স্বপ্নের বিজয়গাথা

খোরশেদ আলম নয়ন

সাবাস, বাংলাদেশ,
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলেপুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

কবি সুকান্তের সেই দুর্মর হৃৎস্পন্দনকেই যেন সেদিন বুকে ধারণ করেছিলেন বাংলার দামাল সন্তানেরা। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রতিবারই প্রমাণ করেছে, যখনই অন্যায়, দুর্নীতি কিংবা স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখনই তারুণ্য জেগে ওঠে ন্যায় ও প্রগতির পতাকা হাতে। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের শুরুতে যা ঘটেছিল, তা ছিল শুধু একটি রাজনৈতিক পালাবদল নয়, বরং ছিল একটি সামাজিক জাগরণ, যেখানে মূল শক্তি ছিল তারুণ্যের দুর্বার গর্জন।

এই অভ্যুত্থান ছিল সেই ক্ষোভের প্রতিফলন, যা বহুদিন ধরে জমে উঠেছিল। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে তরুণসমাজ বার বার অবহেলিত হয়েছে। আর যখন এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তরুণ-তরুণীরা রাস্তায় নামে, তখনই সৃষ্টি হয় পরিবর্তনের ঢেউ। আন্দোলন শহরের সীমানা পেরিয়ে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন।

চট্টগ্রাম বিভাগ– একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি গর্ব। বাংলাদেশের এই বৃহত্তর জনপদ শুধু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং তার বিপ্লবী ঐতিহ্য, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং জাতীয় চেতনার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

চট্টগ্রাম মানেই সংগ্রামের গর্ব আর অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে এই অঞ্চল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাস্টারদা সূর্য সেন, বীর কন্যা প্রীতিলতা আর অনন্ত সিংয়ের মতো বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের বুকে জন্ম নিয়েছিলেন বলেই এই মাটিতে বিদ্রোহের সুরে আজো চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শহিদদের স্মরণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে, যা আন্দোলনের চেতনা ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই বিপ্লব হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাদের অবদান স্মরণ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। চট্টগ্রাম বিভাগের শহিদদের বিস্তারিত তালিকা ও তথ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হলে তা শহিদদের অবদানকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবে এবং তাদের আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অভ্যুত্থানের সময় দেখা যায়, রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ও তরুণদের ঐক্য। তারা কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন চায়নি, তারা চেয়েছিল একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি– যেখানে স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ এবং উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের চর্চা থাকবে। এ আন্দোলনে নারীরাও সমানভাবে অংশ নিয়েছে। তরুণ সাংবাদিক, লেখক ও সামাজিক কর্মী– সবার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে সাধারণ জনগণের। আর তারুণ্যের এই বিজয় শুধু একটি রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল একটি মানসিক মুক্তির শুরু। তরুণরা বুঝিয়ে দিয়েছে পরিবর্তন বাইরে নয়, আসে ভেতর থেকে। নেতৃত্ব মনোভাব ও নৈতিকতার বিবর্তনের মাধ্যমে তারা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই অভ্যুত্থান আমাদের শেখায়– যে জাতির তরুণরা সচেতন, সে জাতিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট ছিল আমাদের জাতীয় জাগরণের আরেকটি স্মারক, যেখানে তরুণদের বিজয় লিখে দেয় ভবিষ্যতের নতুন দিগন্ত। এ অভ্যুত্থান কেবল একটি রাজনৈতিক পট পরিবর্তন নয়, বরং তারুণ্যের শক্তি ও স্বপ্নের বিজয়গাথা! এই প্রজন্ম তাদের সাহস ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, যে-কোনো অন্ধকার কাটিয়ে তারা আলোর পথ দেখাতে পারে।

সমাজে যে-কোনো বৃহৎ পরিবর্তন বা অভ্যুত্থানের পেছনে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আমাদেরও আছে। তারা আগ্রহী, উদ্যমী এবং পরিবর্তনের জন্য স্বপ্নবান। তবে কেবল আবেগ, উচ্ছ্বাস বা উদ্দীপনা কোনো রাষ্ট্র, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন গভীর সংস্কৃতিবোধ, যা জাতির পরিচয়, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

পৃথিবীর ইতিহাসে বহু অভ্যুত্থান তরুণদের হাত ধরে হয়েছে। তরুণরা ছিল পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। তবুও দেখা যায়, অনেক অভ্যুত্থানের পর সেই সমাজ স্থিতিশীলতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদি না সেখানে নেতৃত্বে ছিল সাংস্কৃতিক অন্তর্দৃষ্টি ও ঐতিহাসিক চেতনা।

সংস্কৃতিবোধ মানে কেবল ঐতিহ্য চর্চা নয়, বরং একটি জাতির আত্মপরিচয়, নৈতিকতা, শিল্পবোধ, ভাষা, ইতিহাস ও সমাজ সচেতনতার প্রতি সচেতনতা। যখন নেতৃত্ব বা জনশক্তি এই বোধে সমৃদ্ধ হয়, তখন তারা শুধু ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে না, বরং অতীতের শিক্ষা থেকে গ্রহণ করে বর্তমানকে গড়ে তুলে। আরব বসন্তের পর কিছু দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটলেও বহু ক্ষেত্রে তা অস্থিরতায় পর্যবসিত হয়, কারণ সেখানে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি ছিল না।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নেতৃত্বের কারণে জাতিগত ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির মাধ্যমে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পেরেছিল। চীনের আধুনিক অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে সাংস্কৃতিক শিকড়ে ফিরে যাওয়ার চেতনা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাদের গভীর সংস্কৃতিবোধ জাতীয় ঐক্য এবং আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে তারুণ্যের শক্তি বার বার ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি করেছে যেমন– ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। কিন্তু প্রতিটি আন্দোলনের সফলতা স্থায়ী হয়েছে তখনই, যখন নেতৃত্বে ছিল জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবিক মূল্যবোধ।

উচ্ছ্বাস ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সংস্কৃতিবোধ গভীর ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের পরে একটি সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক অবস্থানের। অভ্যুত্থান বা যুদ্ধ কোনো জাতিকে নতুন পথে পরিচালিত করলেও সেই পথের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয় তখনই, যখন জাতি তার ঐতিহাসিক চেতনাকে ধারণ করে। তরুণদের উদ্যম থেকে শুরু করে বিপ্লব সংস্কৃতিবোধই সেই বিপ্লবের ফলাফলকে টিকিয়ে রাখে। তরুণদের সেই দিকেই প্রস্তুত করা উচিত যাতে তারা শুধু জাগরণের নয়, জাগরণের পরিণতিকে টেকসই করে তুলতেও সক্ষম হয়। তা না হলে জাতি সেই চিরচেনা অনতিক্রান্ত বৃত্তের মাঝেই আবর্তিত হতে থাকবে, যা আমাদের কখনো কাম্য নয়।

খোরশেদ আলম নয়ন: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক,
khorshedalamnayan741@gmail.com

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ঘটনাপ্রবাহে কুমিল্লা

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় দেশের যে কয়েকটি স্থান গণমাধ্যমের শিরোনামে বার বার উঠে এসেছে, কুমিল্লা জেলা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। শহরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে মূলত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও শতবর্ষী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কুমিল্লার সিসিএন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আর্মি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি, কুমিল্লা সরকারি কলেজ ও সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা।

ঘটনাপ্রবাহ

৬ই জুলাই রাত ৯টায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মশাল মিছিল হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে। ৭ই জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার ঘণ্টা অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। ১১ই জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কোটবাড়ি বিশ্বরোড অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। একই দিনে কুমিল্লার জিরো পয়েন্ট কান্দিরপাড় দখল করে মিছিল ও সমাবেশ করে ছাত্রলীগ। বৃহস্পতিবারের শেষ কর্মদিবসে প্রায় ছয় ঘণ্টা সড়ক বন্ধ রেখে মিছিল করে তারা। ১২ই জুলাই সারাদেশে মিছিলের ঘোষণা দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া কলেজে মিছিল হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজের মিছিলে ছাত্রলীগের বাধা প্রদানের ভিডিও করায় কলেজের ডিগ্রি প্রথমবর্ষের ছাত্র ও সাংবাদিক সমিতির সদস্য তামিম হোসেনকে নির্যাতন করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে খবর পেয়ে কান্দিরপাড় পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা তাকে উদ্ধার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ১৩ই জুলাই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লকেড কর্মসূচিতে' হামলার প্রতিবাদে ১৪ই জুলাই পুলিশ লাইনস থেকে গণপদযাত্রা ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ১৬ই জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এসময় পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে উত্তেজিত ছাত্র-জনতা সদর দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়িতে আগুন দেয়, যা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৮ই জুলাই পুলিশ ও বিজিবির সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় শিক্ষার্থীদের। ওই দিন বিকেল ৪টার দিকে পুলিশের সাঁজোয়া যান ও ভ্যানে আগুন দেন শিক্ষার্থীরা।

কারফিউ জারির পর কুমিল্লার বিভিন্ন আবাসিক ছাত্রাবাসে অভিযান চালাতে থাকে পুলিশ। জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় রেলপথ অবরোধ করেন ছাত্ররা। ২৪শে জুলাই বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীসহ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৩১শে জুলাই পর্যন্ত কুমিল্লায় ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সারাদেশে শিক্ষার্থী হত্যা, নিপীড়ন ও শিক্ষকদের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ১লা আগস্ট কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন শিক্ষক প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। ২রা আগস্ট শুক্রবার নগরীর রেসকোর্স এলাকায় গণমিছিল করে ছাত্র-জনতা। মিছিলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়। একই দিনে দাউদকান্দিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেন ছাত্ররা। ৩রা আগস্ট দুপুরে নগরীর পুলিশ লাইনস ও রেসকোর্স এলাকায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে স্বেচ্ছাসেবক ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের হামলায় সাতজন গুলিবিদ্ধ হন, আহত হন অন্তত ৩০ জন। চান্দিনায় উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) গাড়িতে আগুন দেয় ছাত্র-জনতা। এদিন আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১ জন শিক্ষক। ৪ঠা আগস্ট দেবীদ্বার পৌর সদরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রুবেল নামের একজনকে হত্যা করেন। ৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার খবরে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ছাত্র-জনতা আনন্দ মিছিল বের করে।

[সূত্র: সাম্প্রতিক দেশকাল, ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫]

কুবি শিক্ষার্থীদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

কোটা বাতিলের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আদর্শ সদর উপজেলার কোটবাড়ি এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ৪ঠা জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টা দিকে সড়ক অবরোধ করে তারা আন্দোলন শুরু করে। ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী দুই লেনে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে প্রায় ১০ কিলোমিটার সড়কজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এর আগে সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে আবাসিক হল ও মেসের শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়। এরপর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিশ্বরোড অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে তারা পুলিশি বাধার মুখে পড়েন। পরে জাদুঘর সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে কোটবাড়ি বিশ্বরোডে অবস্থান নেন।

সরকারি চাকরিতে ২০১৮ সালের পরিপত্র বাতিল করে কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে এ অবরোধ হয়। চাকরিতে মেধাভিত্তিক নিয়োগ বহাল রাখার দাবিতে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, কয়েকটি দাবিতে তারা অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেছে। ২০১৮ সালের পরিপত্র পুনর্বহাল সাপেক্ষে (সকল গ্রেডে) অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাদ দিতে হবে এবং সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না। দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী বিএম সুমন বলেন, আজকের এই সোনার বাংলায় এখনও পাকিস্তানিদের দোসর রয়ে গেছে। শোষণকারী পাকিস্তানিদের বংশধর হচ্ছে বর্তমান এই আমলারা। এই ৫৬ শতাংশ কোটা বিলোপ চাই। স্বাধীন দেশের গণতন্ত্র মরে যেতে দেব না।

এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরান হোসেন বলেন, মহাসড়ক এক মিনিট অবরোধ হলেও সরকারের কাছে বার্তা চলে যায়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর এ দাবির বিষয়ে সরকার অবগত। মানুষের ভোগান্তি নিরসনে শিক্ষার্থীরা যেন স্থান ত্যাগ করেন। সে ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) কাজী ওমর সিদ্দিকী বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পূর্ণ একমত। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বাংলাদেশের ব্যস্ততম মহাসড়ক। তাই প্রশাসন চেষ্টা করছে যেন দ্রুত তারা স্থান ত্যাগ করে।

[সূত্র: সমকাল, ৪ঠা জুলাই ২০২৪]

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষার্থীরা। এতে রাস্তার দু'পাশে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পূর্বঘোষিত 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ অবরোধ করেন তারা।

জানা গেছে, ৮ই জুলাই সোমবার বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কোটবাড়ি বিশ্বরোড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে প্রতিবাদস্বরূপ বই পড়া ও কবিতা আবৃত্তি করেন তারা। বিকেল সাড়ে ৫টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ চলমান। কর্মসূচি রাত ৮টায় শেষ হবে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

কর্মসূচিতে বাবুল আহমেদ নামে এক শিক্ষার্থীকে দেখা যায় অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ জানাতে। গায়ে সাদা কাপড় জড়িয়ে মহাসড়কের মাঝ বরাবর একটি বেঞ্চের উপর গাছ সদৃশ একটি স্টিলের পাইপের সাথে ঝুলে আছেন তিনি। কাপড়ে লেখা– 'মেধা থাকার পরও কোটা পদ্ধতি আমাকে বাঁচতে দেয়নি, তোর ছেলেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে মা।'

বাবুল আহমেদ বলেন, আমরা কোটা পদ্ধতি বাতিল চাই। সে লক্ষ্যেই আজকের প্রতিবাদ। প্রতীকী অর্থে এই বেশে দাঁড়িয়েছি। কোটার কারণে অনেক মেধাবী ঝরে যাচ্ছে। এটি মেধা হত্যার শামিল। আমার জায়গা থেকে তারই প্রতিবাদ জানিয়েছি।

[সূত্র: সমকাল, ৮ই জুলাই ২০২৪]

সকলের জন্য উন্মুক্ত হলো রেলওয়ে হাসপাতাল

বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে এখন থেকে সাধারণ জনগণও চিকিৎসা সেবা নিতে পারবেন। বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২১শে এপ্রিল রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান নিজ নিজ দপ্তরের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এ হাসপাতালগুলো স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে যৌথভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে। তবে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং রেলপোষ্য ও যাত্রী সাধারণের চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল সুযোগ-সুবিধা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় রেলওয়ে হাসপাতালগুলো সর্ব সাধারণকে সেবাদানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে অধিক সংখ্যক মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাস্থ্য সেবা পাবেন বলে সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

রক্তাক্ত জুলাই ও চট্টগ্রামে গ্রাফিতি বিপ্লব

মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন

চট্টগ্রাম এমন একটি ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ভূপৃষ্ঠের নাম, যার সাথে মিশে আছে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন ও সংগ্রাম। জগৎজুড়েও এর নাম ও সুনাম। সেজন্য চট্টগ্রাম নামটি উচ্চারণের সাথে সাথে 'বীর চট্টলা' কথাটিও সামনে চলে আসে। সুপ্রাচীনকাল থেকে দেখা গেছে চট্টগ্রাম কখনো মানেনি হার। ইতিহাস বলে– চট্টগ্রাম হলো বিপ্লবের সূতিকাগার। কেউ কেউ চট্টগ্রামকে 'বীর প্রসবিনী চট্টলা' বলেও অভিহিত করে থাকেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক প্রবাদে আছে– 'চাটগাঁইয়া পোয়া, মাড়িত ফইরলে লোয়া'। অর্থাৎ চট্টগ্রামের ছেলে, লোহা হয়ে যায় মাটিতে পড়লে। লোহা হচ্ছে শক্ত-সামর্থ্য তথা শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। চট্টগ্রামের ছেলেরাও যেন তাই। এখানকার পাহাড়গুলো শীলাদৃঢ় শপথ নিয়ে বীরত্বের প্রতীক হয়ে যুগ যুগ ধরে দণ্ডায়মান। সমুদ্রের ঢেউগুলো সংগ্রামী সংগীত গেয়ে সদা বহমান। পীর আর বীরের দেশ বলেও খ্যাত চট্টগ্রাম। প্রাচ্যের প্রবেশ দ্বারও বলা হয় চট্টগ্রামকে। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত পণ্ডিত, পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী এই জাগ্রত জনপদে পা রেখেছেন তার হিসাব নেই। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্‌দীন, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকের আগমন ঘটেছে চিরজাগ্রত এই চট্টগ্রামে। অনেকে তাদের কথায়, কবিতায় ও স্মৃতিকথায় চট্টগ্রামের বিপ্লবী চরিত্রও তুলে ধরেছেন। জালিমের আতঙ্ক কবি সুকান্ত তাঁর 'চট্টগ্রাম: ১৯৪৩' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন–

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম–
চট্টগ্রাম: বীর চট্টগ্রাম!
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎ প্রবাহ আনে, আজ চেতনার দিন;
চট্টগ্রাম: বীর চট্টগ্রাম! এখনো নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী।
জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে; গ্লানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদ্দাম–
হে চট্টগ্রাম!
তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দুলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
...
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।

বন্দর সুবিধা ও বাণিজ্য সম্পদের লোভে যুগে যুগে বহু বিদেশির চোখ পড়ে চট্টগ্রামে। নিকট অতীতের দিকেও যদি অবলোকন করি, কী পর্তুগিজ হার্মাদরা, কী মগ দস্যুরা, কী ব্রিটিশ বজ্জাতরা, কী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক-শোষকরা– সবাই চট্টগ্রামকে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে। তবে বিপ্লবী চরিত্রের কারণে চট্টগ্রামকে বেশিদিন কেউ দাবিয়ে বা দমিয়ে রাখতে পারেনি। কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'আমার অভিবাদন গ্রহণ করো সুন্দর, বীর চট্টলা' শীর্ষক লেখার একস্থানে লিখেছেন, 'চট্টগ্রামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর সংগ্রামী ঐতিহ্য।' (*দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৪)। ব্রিটিশবিরোধী আজাদী আন্দোলনের সূর্য সন্তান সূর্য সেন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 'মাস্টারদার হাতঘড়ি' শীর্ষক কবিতার একস্থানে তিনি লিখেছেন–

মাস্টারদা, সেই যে মাঝে মাঝে
আপনার কণ্ঠে উচ্চারিত হতো একগুচ্ছ শব্দ,
সেই অনুসারে আপনি নিজে
চোখেও শুনতেন, কানেও দেখতেন।
ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বীর আশফাক উল্লাহ, অপরূপ
অগ্নিবলয়ের মতো এক মহামাল্যের মণিরত্ন,
ওদের ঝলকানিতে গান গেয়ে উঠতো
আপনার চেতনা, যখন আপনি বসে থাকতেন
চুপচাপ, নীল নকশা আঁকতেন প্রতিরোধের
কিংবা সহযাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতেন
সামনে পা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে।

সত্যেন সেন তাঁর *মহাবিদ্রোহের কাহিনি* গ্রন্থে সিপাহি বিদ্রোহের সাহসী সন্তান চট্টগ্রামের হাবিলদার রজব আলীর কথা লিখতে গিয়ে 'সাবাস চট্টগ্রাম' শিরোনামের লেখার একস্থানে লিখেছেন– "সমস্ত বাংলাদেশে চট্টগ্রামের সিপাইরাই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য রাজপথে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সমস্ত বাংলাদেশ, তথা সমস্ত ভারতজুড়ে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল– 'সাবাস চট্টগ্রাম'। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিবেলায় চট্টগ্রাম যখন বিদ্রোহের পথ দেখাল, সেদিনকার বাংলাদেশজুড়ে কি তেমনি জয়ধ্বনি উঠেনি– 'সাবাস চট্টগ্রাম'!"

আধুনিক বাংলা কবিতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি আল মাহমুদের কবিতায়ও প্রত্যক্ষ করা যায় পাহাড়তলীর প্রতিরোধের কথা। 'একুশের কবিতা' শীর্ষক কবিতার একস্থানে তিনি লিখেছেন–

পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়

ঝাপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারীর শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।

ব্রিটিশবিরোধী আজাদী আন্দোলনের কথা বলতে গেলে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের কথাও অনিবার্যভাবে চলে আসে। চট্টগ্রামের সন্তান যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং 'শেখ-ই-চাটগাম' কাজেম আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন এতটাই সফল হয়েছিল যে, মহাত্মা গান্ধী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'Chittagong to the fore' (চট্টগ্রাম সবার আগে)। *ছোলতান* পত্রিকায় দাবি করা হয়েছে যে, 'চট্টগ্রাম খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।'(*ছোলতান*, ২২শে জুন ১৯২৩)। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনেও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল চট্টগ্রাম। সেসময় প্রতিবাদ-প্রতিরোধে প্রথম যে পদাবলিটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল চট্টগ্রাম থেকে। সেই পদাবলিটির নাম 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। আর এর রচয়িতার নাম মাহবুব উল আলম চৌধুরী। একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতাকে উপজীব্য করে বাংলা ভাষায় প্রথম যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিও প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে, চট্টগ্রামের জনপ্রিয় *দৈনিক আজাদীর* বিশেষ এক সংখ্যায়। সেটি লিখেছিলেন চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক কাজী জাফরুল ইসলাম।

চব্বিশেও চট্টগ্রামকে দেখা যায় বিপ্লবী চরিত্রে। চট্টগ্রামের বিপ্লবী চরিত্র চব্বিশেও ছিল চির দুর্দম ও চির দুর্বিনীত। এই গণবিপ্লবে গ্রাফিতির ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যা ইতঃপূর্বে এতটা ব্যাপক হারে, এতটা তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে দেখা যায়নি। আর এক্ষেত্রে তরুণ তুর্কিরা ছিল মূখ্য ভূমিকায়। বিগত পনেরো বছর বড়োরা বা বুড়োরা যা করতে পারেনি, চব্বিশের তারুণ্য জুলাই বিপ্লবে তা করে দেখিয়ে দিয়েছে। যে তরুণদেরকে তাদের মা-বাবারা পারিবারিক পরিসরে তেমন গুরুত্ব দিতে চান না, সেই তরুণরাই চব্বিশের বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, তরুণরা না হলে জুলাই বিপ্লব কখনো সম্ভব ও সফল হতো না। বিদ্রোহী কবি নজরুলের একটি গানে আছে– 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়'– জুলাই বিপ্লবে জুলুমের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের তরুণরা ছিল 'কালবোশেখীর ঝড়'। আর এতে 'ঐ নূতনের কেতন' ছিল গ্রাফিতি। সবচেয়ে অবাক হওয়ার ব্যাপার ছিল এই যে, এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্য কবি নজরুল তাঁর সমাধি থেকে বেরিয়ে এসে তরুণদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন! তখন সমস্ত তরুণকে মনে হয়েছিল একেকজন নজরুল। নজরুলের কবিতা ও গানের ভাষা এবং গ্রাফিতির ভাষা এক হয়ে এই গণবিপ্লবকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দাঁড় করিয়েছিল এবং বিপ্লবকে সফল করেছিল।

এখন দেখি, গ্রাফিতি কী? জনগণের অভিমতকে শৈল্পিক উপায়ে লেখনী কিংবা অঙ্কনের মাধ্যমে

দেয়ালের উপর দ্রষ্টব্য করাকেই গ্রাফিতি বলে। গ্রাফিতি আঁকা হয় সাধারণত বিনা অনুমতিতে। এর কনটেন্ট থাকবে সাধারণ, আঁকাও থাকবে সাধারণ, কিন্তু পেছনের বোধ বা বয়ানটা থাকবে গভীর। গ্রাফিতি শব্দটি এসেছে ইতালিয়ান শব্দ Grafitiato থেকে, যার মানে 'খচিত'। গ্রাফিতি সৃষ্টির উপকরণ হলো স্প্রে, পেইন্ট বা মার্কার পেন। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে গ্রাফিতি হলো শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম। এর সাথে চিত্র ও চিন্তার লিখিত ভাষ্যে ব্যঙ্গবিদ্রুপের সহযোগ যখন ঘটে, তখন গ্রাফিতির ভাষা আরও শাণিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শত্রুর বিপক্ষে ও শান্তির পক্ষে আবেদন সৃষ্টি ও অবদান রাখতেও এর ভূমিকা অনন্য। গ্রাফিতির ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতো পুরানো। অনুমান করা হয়, মানুষ যখন গুহায় বাস করত, তখন থেকেই অভিযাত্রা হয়েছিল এই শিল্পমাধ্যমের। আর তা করা হয়েছিল গুহার দেয়ালে পশুর হাড় দিয়ে খোদাই করে। প্রাচীনকালের গ্রাফিতিগুলো বর্তমানের চেয়ে আরও অধিক অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ছিল, ছিল বিচিত্র ধারায় বিকশিত। এতে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও ঘটত। ভিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সময়কার গ্রাফিতিগুলো সংরক্ষিত ছিল পম্পেই নগরীতে। নভেলিয়া প্রিমিগেনিয়া নামের এক সুন্দরী পতিতার ব্যাপারে জানা যায় গ্রাফিতি থেকে।

জুলাই বিপ্লবের আগে এদেশে গ্রাফিতি নিয়ে মাতামাতি করত না কেউ। এই ঐতিহাসিক বিপ্লব যখন শুরু হয়, চট্টগ্রামেও লাগে এর ঢেউ। তখনও কুরসিতে বসে দেশ শাসন করছিল স্বৈরাচার। চারদিকে চলছিল গুম, খুন, হামলা, মামলাসহ নানাবিধ নারকীয় অত্যাচার ও হুঙ্কার, যেন দেশটা তাদের বাপ-দাদার! জনগণের ছিল না বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার। তখন কবিতা ও গানের মতো গ্রাফিতিও হয়ে ওঠে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার নান্দনিক নতুন হাতিয়ার। সবচেয়ে অবাক হাওয়ার ব্যাপার– আগে থেকে যেখানে অভাব ছিল অভিজ্ঞতার, বিপ্লবের ঢেউ লেগে হঠাৎ শুরু হয়ে যায় গ্রাফিতির ব্যাপক ব্যবহার। শহরের গুরুত্বপূর্ণ দেয়ালসমূহের কোনোটিই ছিল না বাকি, গ্রাফিতিতে ভরে যায় সব। জুলাই বিপ্লবের বদান্যতায় গ্রাফিতিতেও আসে বিপ্লব। মানুষের মুখে তখন একটাই রব– 'এক দফা এক দাবি, স্বৈরাচার তুই কবে যাবি!'

চট্টগ্রাম তো ঐতিহাসিকভাবে ও ঐতিহ্যগতভাবে বিপ্লবের সূতিকাগার। জুলাই বিপ্লব সেই ক্ষেত্রে আনে এক যৌবন জোয়ার। এ যেন বিদ্রোহী কবির কবিতার 'মানেনা বারণ, ভরা যৌবন, শক্তি প্রবাহ ধায়/ মরণ তার জীবন ছন্দে কূলে কূলে উছলায়।' 'যৌবন জোয়ার' কথাটা এজন্যই আনলাম– তরুণরাই পারে দেশের জন্য ও দশের জন্য দিতে জান কুরবান। তখন চট্টগ্রামেও আমি সচক্ষে দেখেছি তারুণ্যের তুফান। কেউ ভাবতেই পারেনি তারুণ্য এভাবে বৈষম্যের দেয়াল ভাঙবে এবং ভয়কে জয় করবে। তাদের প্রত্যয় ও প্রতিরোধের প্রাবল্য দেখে স্বৈরাচার পালাবে! দেশের অন্যান্য শহরের মতো

চট্টগ্রাম শহরের প্রতিটি রাস্তায় ও অলিতে-গলিতেতরুণরা ছিল খুব তৎপর। তাদের অন্তরে ছিল না এতটুকু ভয়ডর। জুলাইয়ের তিরিশ তারিখ পার হওয়ার পর সেই তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দু'পাশের দেয়ালগুলো ভরে যায় লেখায়-রেখায়। সবচেয়ে তাৎপর্যের ও তাজ্জবের ব্যাপার– এবারের আন্দোলনে তরুণদের পাশাপাশি তরুণীদের অংশগ্রহণও ছিল বেশুমার। কেউবা শাড়ি পরা, কেউবা সালোয়ার কামিজ পরা, কেউবা হিজাবে ঢাকা, কিন্তু রাস্তার দু'পাশের কোনো দেয়ালকে তারা রাখেনি ফাঁকা। আমি জুলাই তিরিশের পর প্রতিদিন নিয়ম করে রাস্তায় বের হতাম। ঘুরে ঘুরে মনের খেয়ালে আঁকা দেয়ালের চিত্র ও চরিত্রগুলো দেখতাম এবং চিন্তায় ভাষ্যগুলো পড়তাম! আগ্রাবাদ থেকে আরম্ভ করে চৌমুহনীর মোড়, দেওয়ান হাট মোড়, লালখান বাজার মোড়, ওয়াসার মোড়, ও. আর. নিজাম রোড, দেব পাহাড়ের মোড়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, জামালখান মোড়, চেরাগীর মোড়, আন্দরকিল্লার মোড়, লালদিঘীর মোড়, নিউ মার্কেটের মোড় প্রভৃতি স্থান পালাক্রমে পরিদর্শন করে দেখেছি সংগ্রামে অটল ও অকুতোভয় ছাত্র ও জনগণ। তখন যতটুকু পেরেছি, দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতিসমূহ দেখার ও ভাষ্য পড়ার চেষ্টা করেছি। যেমন একটিতে দেখেছি ধর্মীয় পোশাক পরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও মুসলমানের মিলিত ছবি। সবার হাতে দেশের পতাকা। পাশে লেখা– 'ধর্ম যার যার, দেশ সবার'। আরেকটি গ্রাফিতিতে দেখা যায়, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ছাত্র-জনতা সামনের দিকে জোর কদমে এগিয়ে চলছে, পাশে লাল রং দিয়ে লেখা– 'পুলিশ-জনতা ভাই ভাই, দুঃশাসন হটাতে ঐক্য চাই'। একটিতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা আছে– 'বৌধদিন হাইয়ো, আর নও হাইয়ো'। অর্থাৎ বহুদিন খেয়েছ, আর খেও না। একটি গ্রাফিতিতে লাল-কালো-সবুজ সংবলিত মানুষের হাতের তালুসহ পাঁচ আঙুলের ছাপ, মাঝে লেখা আছে– 'নয় ছয় বাদ দাও, নতুন বাংলাদেশ গড়তে দাও'। একটি গ্রাফিতির মাঝখানে দাঁড়ানো আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কয়েকজন সদস্য, তাদের সামনে তাদেরই দিকে মুখ করে মিছিলের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অকুতোভয় এক কিশোর। তার দু'পাশে মিছিলের ভাষায় লেখা– 'যত করবে অত্যাচার, রুখে দাঁড়াবো ততবার'। আরেকটি গ্রাফিতিতে দেখা যায়, একটি সাদা পায়রা স্বাধীনতার স্বাদ লাভের আশায় খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যায়– পিঠে তার রক্তের দাগ, তার বামে লাল-সবুজের বাংলাদেশের পতাকা, মাঝখানে লেখা '৩৬ জুলাই'। এভাবে আরও অসংখ্য অসংখ্য গ্রাফিতি এখনো শোভা পায় বীর প্রসবিনী চট্টলার দেয়ালে দেয়ালে, যেগুলো এঁকেছিল নাম না জানা চট্টগ্রামের অসংখ্য তরুণ-তরুণী সেই বিপ্লবকালে মনের খেয়ালে। তাদের অন্তরে ছিল স্বৈরাচারী শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির আশা। সেসবই এখন বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস।

মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন: কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও রম্যলেখক

জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট সেবার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৪শে এপ্রিল দূতাবাসের হলরুমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুখ্য সচিব বলেন, ই-পাসপোর্ট সেবা চালু হলে জাপান থেকে ভ্রমণ ও ইমিগ্রেশন আরও সহজ হবে। সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন দেশে সময়মতো পাসপোর্ট পাওয়া নিয়ে প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের যে অভিযোগ ছিল, সরকার তার সমাধান করেছে। এখন স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রবাসীরা পাসপোর্ট হাতে পাচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী বলেন, জাপানে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুর মাধ্যমে এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হলো। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক মেজর আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কর্মকর্তা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধি, জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্য ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

সড়ক অবরোধ থেকে সরে গণসংযোগে চবি শিক্ষার্থীরা

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে ২০১৮ সালে সরকারের জারি করা পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি থেকে সরে এবার গণসংযোগে নেমেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেট এলাকার চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা দিলেও শিক্ষার্থীরা তা করেননি। এ কর্মসূচির পরিবর্তে ৯ই জুলাই মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গণসংযোগ করেন।

জানতে চাইলে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ বলেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী আজ অবরোধ কর্মসূচি থেকে আপাতত সরে এসেছি। নির্দেশনা অনুযায়ী আজ গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সকাল ১১টার দিকে শহিদমিনারের সামনে জড়ো হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থী। সেখানে বিক্ষোভ শেষে মিছিল নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জননেত্রী শেখ হাসিনা হলের সামনে যান। পরে ছাত্রীদের আরও চারটি আবাসিক হল– দেশনেত্রী খালেদা জিয়া, প্রীতিলতা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও শামসুন নাহার হলের সামনে যান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। পরে দুপুর দুইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এসে কর্মসূচি শেষ করেন তারা।

কর্মসূচিতে জননেত্রী শেখ হাসিনা হলের ছাত্রী কানিজ ফাতেমা বলেন, আমার নানা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কিন্তু আমি নিজে কখনও এই কোটা ব্যবহার করিনি। অনেককে দেখলাম একটু আগে পাঠাগারে চাকরির জন্য পড়াশোনা করছেন। তাদেরকে আমি আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করব। কোটা বহাল রেখে পড়েও কোনো লাভ নেই।

২০১৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর সরকারি চাকরিতে (৫৬ শতাংশ) কোটা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এর পর থেকে টানা সাড়ে পাঁচ বছর কোনো কোটা ছাড়াই নবম থেকে ১৩তম গ্রেডে নিয়োগ হয়। ২০২১ সালে ওই পরিপত্রের ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল হওয়ার অংশটিকে চ্যালেঞ্জ করে কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাইকোর্টে রিট করেন। পরবর্তীতে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে গত ১লা জুলাই থেকে আন্দোলন করে যাচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

শিক্ষার্থীরা চার দাবি নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করছেন। দাবিগুলো হলো– ২০১৮ সালে ঘোষিত সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ও মেধাভিত্তিক নিয়োগের পরিপত্র বহাল রাখা। পরিপত্র অনুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারি চাকরিতে (সব গ্রেডে) বৈষম্যমূলক কোটা বাদ দিতে হবে (পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ছাড়া)। সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না এবং কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলোতে মেধা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

[সূত্র: সমকাল, ৯ই জুলাই ২০২৪]

শিক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জ: প্রতিবাদে আড়াই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে আন্দোলরত শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর ষোলশহর দুই নম্বর গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে নারীসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর আগে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে কয়েকজন পুলিশ সদস্যও আহত হয়েছেন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটার প্রতিবাদে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে দুই নম্বর গেটের গোলচত্বর ঘিরে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। ফলে চট্টগ্রাম নগরীর প্রধান সড়ক সিডিএ অ্যাভিনিউতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে বায়েজিদ বোস্তামী সড়কেও যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রধান সড়কের যানজট ছড়িয়ে পড়ে নগরীর শাখা সড়কগুলোতেও।

রাত ৮টার দিকে অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে আড়াই ঘণ্টা অচল ছিল চট্টগ্রাম নগরীর একাংশ। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। সাপ্তাহিক ছুটি সামনে রেখে অফিস শেষে বাড়ি ফেরা লোকজনও পথে আটকা পড়েন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটার খবর ছড়িয়ে পড়লে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটে হাটহাজারী-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী দুপুর আড়াইটা থেকে নগরীর রেলওয়ে স্টেশনে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। বিকেল ৪টায় মিছিল নিয়ে বের হন। পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে পুলিশ। টাইগারপাসের দিকে যাওয়ার পথে পলোগ্রাউন্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে পূর্ব থেকে অবস্থান নেওয়া পুলিশ সদস্যরা তাদের সামনে যেতে বাধা দেন। এতে দুইদিকে পুলিশি ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান শিক্ষার্থীরা। এসময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতির

ঘটনা ঘটে। ব্যানার নিয়ে টানাহেঁচড়া হয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে টাইগারপাসের দিকে চলে যায়। সেখানে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শিক্ষার্থীরা পুনরায় জড়ো হয়ে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে লালখান বাজার, ওয়াসা, দামপাড়া, জিইসি হয়ে দুই নম্বর গেটের দিকে যান।

সেখানে পূর্ব থেকে অবস্থান ছিল পুলিশের। শিক্ষার্থীরা দুই নম্বর গেট চত্বরে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করলে শুরুতে পুলিশ সামনে থেকে ব্যারিকেড দেয়। পুলিশ কর্মকর্তারা এসে তাদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। লাঠিচার্জ করে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের অনড় অবস্থানের কারণে পিছু হটেন পুলিশ সদস্যরা। পরে সড়কের মাঝখানে ও চারপাশে অবস্থান নেন কয়েকশো পুলিশ। রয়েছে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরাও। শিক্ষার্থীরা দুই নম্বর গেট চত্বরে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এসময় তারা– 'পুলিশ দিয়ে আন্দোলন, বন্ধ করা চলবে না'; 'আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেবো না'; 'আমার বোনের উপর আঘাত কেন? জবাব চাই'– এসব স্লোগান দেন। রাত ৮টায় দুই নম্বর গেট থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে নগরীর ষোলশহর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে চলে যান শিক্ষার্থীরা।

পুলিশের লাঠিচার্জে আহত শিক্ষার্থী রেজাউর রহমান বলেন, সেই বাহান্ন সাল থেকে পুলিশ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে হামলা করে আসছে। আমার বুকে এই রক্তের দাগ রাষ্ট্রের জন্য লজ্জার। সংবিধানের জন্য লজ্জার। আমরা মরে গেলেও এই রাজপথ ছাড়ব না।

শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটার বিষয়টি অস্বীকার করে নগর পুলিশের উপ-কমিশনার (উত্তর) মোখলেসুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের আমরা লাঠিপেটা করিনি। আমরা শুধু ব্যারিকেড দিয়েছিলাম। আমরা তাদের বুঝিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তারা ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে গিয়ে সড়কে অবস্থান নিয়েছে।

[সূত্র: সমকাল, ১১ই জুলাই ২০২৪]

বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতামূলক ভ্যানের উদ্বোধন

মেছো বিড়ালসহ বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়াতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চালু হয়েছে বিশেষ ভ্যান। এই ভ্যান ঘুরবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা। জানাবে বন্যপ্রাণী রক্ষার কথা। সচেতন করবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে। ২২শে এপ্রিল যশোরে এই সচেতনতামূলক ভ্যানের উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, যশোর সামাজিক বন বিভাগের সংরক্ষক, বন বিভাগের কর্মকর্তা, পরিবেশ সংগঠনের প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

উপদেষ্টা বলেন, প্রাণীর প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে হবে। মেছো বিড়ালসহ সব বন্যপ্রাণী রক্ষায় সচেতনতা জরুরি। প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের বাঁচাতে হবে। তিনি বলেন, অনেকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মেছো বিড়ালকে মেরে ফেলেন। অথচ এরা ক্ষতি করে না। বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে গঙ্গা-প্লাবিত এলাকা জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। কিন্তু এই এলাকায় প্রাণী সংরক্ষণের উদ্যোগ ছিল কম। এখানে আছে মেছো বিড়াল, ধূসর হনুমান, খেকশিয়াল, মদনটাক, ঈগল, মানিকজোড়সহ নানা বিরল প্রাণী। পদ্মা ও তার শাখা নদীতে দেখা যায় বিপন্ন ঘড়িয়াল ও বিলুপ্তপ্রায় কুমিরও।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, যথাযথ সংরক্ষণ না থাকায় ও বাসস্থান ধ্বংসের ফলে বন্যপ্রাণী আজ হুমকিতে। মানুষের বসতির কাছে চলে আসায় প্রাণীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বও বাড়ছে। এতে প্রাণ হারাচ্ছে অনেক বন্যপ্রাণী।

এই বিষয়টি বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের নজরে আসার পর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শুরু হয়েছে নানা উদ্যোগ। এ বছর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পালন করা হয়েছে বিশ্ব মেছো বিড়াল দিবস। মেছো বিড়ালসহ সকল প্রাণী রক্ষায় এই সচেতনতামূলক ভ্যান কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: শারমিন ইসলাম

মোমবাতি জ্বালিয়ে আন্দোলনে কুবি শিক্ষার্থীরা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মোমবাতি জ্বালিয়ে আন্দোলন করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাদের ওপর হামলার বিচারের আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত মহাসড়ক ছাড়বেন না বলে জানান তারা। হামলার কারণে প্রশাসনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, একই সঙ্গে প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, প্রশাসন ও প্রক্টরের ইন্ধনেই পুলিশ ক্যাম্পাসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে। এ কারণে তারা প্রশাসনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও প্রক্টরের অপসারণ দাবি করেন।

১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে তানভীর হাসান নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, প্রশাসন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি মীমাংসা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন থেকে সরব না। দরকার হলে আজকে সারারাত আমরা আন্দোলন করব। এর আগে দুপুরে প্রক্টরের উপস্থিতিতে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে পুলিশ। এরপর আন্দোলন আরও তীব্র হয় এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: সমকাল, ১২ই জুলাই ২০২৪]

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

কোটা সংস্কারের দাবিতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে শিক্ষার্থীরা। ১২ই জুলাই শুক্রবার বিকেল ৩টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নেন শতাধিক শিক্ষার্থী।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন রসায়ন বিভাগের ছাত্র আনোয়ার হোসেন টুটুল, ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী তাহমিনা আক্তার, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্রী তানিয়া আক্তার প্রমুখ। এসময় শিক্ষার্থীরা বলেন, এই সরকার আদালতের দোহাই দিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল করে ফেলছে।

তারা বলেন, সরকার আন্দোলন দমনে পুলিশকে মাঠে নামিয়েছে। শিক্ষার্থীদের শরীর থেকে রক্ত ঝরাচ্ছে। কোটা নিয়ে সরকারের মন্ত্রীরাও ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে সরকারপ্রধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবিসহ জাতীয় সংসদে কোটা সংক্রান্ত বিল পাসের দাবি জানান।

[সূত্র: সমকাল, ১২ই জুলাই ২০২৪]

বীর চট্টলার বীরত্বগাথা

ড. শিল্পী ভদ্র

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য চট্টগ্রামকে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'বীর চট্টগ্রাম' নামে আখ্যায়িত করেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী সার্বিক স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামবাসীর অতুলনীয় বীরত্ব, অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ, অনুপম সাহসিকতা এবং ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে (পঞ্চাশের মন্বন্তর) অসহায় মানুষের প্রতি চট্টগ্রামবাসীর উদার অবদানে মুগ্ধ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামবাসীর কৃতিত্ব প্রকাশ করে 'চট্টগ্রাম: ১৯৪৩' নামের একটি কবিতা লিখেন। এই কবিতায় তিনি চট্টগ্রামকে 'বীর চট্টগ্রাম' নামে আখ্যায়িত করেন। 'চট্টগ্রাম: ১৯৪৩' কবিতার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি হচ্ছে– 'ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এক নিভৃত নাম/চট্টগ্রাম! বীর চট্টগ্রাম!' সাতচল্লিশের পাকিস্তান আন্দোলন, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পুরোভাগে ছিল চট্টগ্রাম। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাও এ মাটি থেকেই।

চট্টগ্রাম নামের নেপথ্যেও রয়েছে সামরিক ইতিহাস। আরাকানি শব্দ 'চইট্টেগং' বা 'চইট্টেকুং' থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি বলে জানা যায়। আবদুল হক চৌধুরীর মতে, আরাকানি ভাষায় 'চইট্টে' অর্থ সেনানিবাস বা দুর্গ আর 'গং' অর্থ শক্তিশালী, দুর্ভেদ্য, শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, প্রধান প্রভৃতি। 'চইট্টে' আর 'গং' -এর মিলনে চইট্টেগং শব্দটির অর্থ শক্তিশালী, দুর্ভেদ্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক সেনানিবাস। তেমনি চইট্টেকুং শব্দটিও সমার্থক এবং এ এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠনশৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে কুং অর্থ পাহাড়চূড়া। চইট্টেকুং মানে পাহাড়চূড়ার সেনানিবাস।

চাটগাঁ দুর্গ এত সুরক্ষিত বলে তিনবার আক্রমণ প্রচেষ্টার পরই মোগলদের চাটগাঁ দুর্গ অধিকৃত হয়েছিল এবং এর নবতর নাম হয়েছিল আন্দরকিল্লা (পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস, সংগ্রামের নোটবুক*)। সমুদ্র এবং পর্বতবেষ্টিত এই অঞ্চল একটি প্রাচীন ভূখণ্ড এবং এর সঙ্গে আরাকানদের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। এটি সুনিশ্চিত যে, আরাকান ও চট্টগ্রাম একই ভূখণ্ড। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি হিসেবে পুরাকালে আরাকান চট্টগ্রাম স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং সভ্যতা, সংস্কৃতি,

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে প্রভূত প্রভাব বিস্তার ঘটায় (আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের সংগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রামের নোটবুক*)।

চট্টগ্রামের ইতিহাস এবং তার সংগ্রামী ইতিহাসও সুপ্রাচীন। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নব্য প্রস্তর যুগের ছয়টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে দুটি ভষ্মীভূত কাঠের অস্ত্রপ্রাপ্তির সূত্রে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংগ্রামী সুপ্রাচীনতা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকগণ বর্তমানে নিঃসন্দেহ। ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় খ্রিষ্টীয় প্রথম

শতকের স্ট্রাবোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং জল বাণিজ্য তত্ত্বের আদি গ্রন্থ রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির *Periplus of the Erythraean Sea* থেকে সমুদ্র বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের পরিচয় জানা যায়। চাটগাঁ দুই হাজার বছরের অধিক কাল পর্যন্ত এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিগণিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রমেখলা এবং পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত চট্টগ্রামের বন্দর সুবিধা, বাণিজ্য প্রসার, প্রাকৃতিক অঢেল সম্পদ, রণ কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এমনকি তৎকালীন নৌপ্রযুক্তির উৎকর্ষ ইত্যাদির কারণে প্রাচীন শক্তিশালী সামরিক জাতিসমূহের নিকট এ অঞ্চল সবসময়ই আকর্ষণীয় ছিল। ফলে এ অঞ্চলের জনজীবন, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে ঐতিহাসিক কাল থেকেই সার্বক্ষণিক সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজ করত। তাই চট্টগ্রামবাসীকে কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ত সংগ্রামশীল থাকতে হয়েছে।

পাহাড়, পর্বত, নদী, খাল, সমুদ্র, উপত্যকা, অরণ্য প্রভৃতি নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যের মিছিলে এ অঞ্চল সমতল ভূমি থেকে এক ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে সংস্থাপিত। জীবনের উপাদান আহরণে এবং জলবায়ুগত কারণে এ অঞ্চলের মানুষকে অবিরত লড়াকু অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাস অনুযায়ী খ্রিষ্টীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি চন্দ্রসূর্য নামের এক মগধ সামন্ত কর্তৃক চট্টগ্রাম আরাকান সমন্বিত প্রাচীন ভূভাগ রাজ্যে স্থাপিত হয়। চন্দ্রসূর্য বংশের কয়েক শতাব্দী শাসনের পর পালাক্রমে সমতট, পাল, হরিকেল, পাট্টিক, ত্রিপুরা, পগা, পারিম প্রমুখ রাজবংশ এবং আরাকান রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় (আবদুল হক চৌধুরী, *১৯৯৪: ৫-৭, চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস, সংগ্রামের নোটবুক*) ।

চতুর্দশ শতক থেকে এ অঞ্চল মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। সুলতানি, আফগানি, মোগল, নবাবি ইত্যাদি আমলে দীর্ঘকাল ধরে চট্টগ্রামকে মুসলমান শাসন, সমর ও প্রভাব বলয়ে কাটাতে হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন সময়ে আরাকানিদের সাথে অব্যাহত ক্ষমতার লড়াইও বিদ্যমান ছিল।

পাশাপাশি ছিল মগ, পর্তুগিজ প্রমুখ জলদস্যুদের সশস্ত্র তৎপরতা। সমগ্র মোগল আমলে ইউরোপীয়রা চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনে নিষ্ফল সামরিক প্রয়াস পরিচালনা করে। কারণ চট্টগ্রামের সুপ্রাচীন বন্দর ও পোতাশ্রয় ইংরেজদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু মোগল সুবেদার ও চট্টগ্রামস্থ তার ফৌজদারদের চেষ্টায় ইংরেজদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত আঠারো শতকে এসে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মতো চট্টগ্রামকেও ইংরেজদের অধিকারে যেতে হয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে চাকমা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৭৭৬ সালের মধ্যভাগে চাকমারা প্রথম বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চাকমা রাজা শের দৌলত এবং সেনাপতি রামুখা। তারা চাকমাদের সংঘবদ্ধ করে ইজারাদারি ও ইংরেজ শাসন অবসানের জন্য প্রস্তুতির লক্ষ্যে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেন।

যতদিন চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ইজারাদার প্রথা প্রচলিত ছিল ততদিন চাকমা জাতি বারংবার বিদ্রোহ করেছে। লড়াই করে গেছে গেরিলা পদ্ধতিতে। চাকমা বিদ্রোহীদের ফাঁদে আটকা পড়ে অগণিত ইংরেজ ও অন্য সরকারি সৈন্যকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ইংরেজরা ইৎরা প্রথা ও কার্পাস কর ব্যবস্থা তুলে পরিমিত জমা ধার্য ও চাকমাদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

উনিশ শতকে ভারতবর্ষে প্রভূত শক্তিশালী ইংরেজ শাসনের ভিত্তি ভূমিকায় অস্থিতিশীল করে দিয়েছিল ঐতিহাসিক সিপাহি বিদ্রোহ। এই সিপাহি বিদ্রোহের ঢেউ চট্টগ্রামে অবস্থিত ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফেন্ট্রির ২, ৩ ও ৪ নম্বর সিপাহিদের মাঝেও এসে লাগে। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ৩৪ নম্বর নেটিভ ইনফেন্ট্রি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামে দেশীয়

পদাতিক কোম্পানির সিপাহিরা রজব আলি নামের এক হাবিলদার এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। ইংরেজ বাহিনীর সাথে সিপাহিদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী সিপাহিরা শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে এই সাড়া জাগানো বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। তবে ভারতবর্ষ ব্যাপী সংঘটিত এই বিদ্রোহের ইতিবৃত্তে চট্টগ্রামের বিদ্রোহ, গৌরবোজ্জ্বল এক ব্যতিক্রম ঘটনা।

উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে ভারতের সর্বত্র ইংরেজ সরকারের দমনপীড়নমূলক অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। চট্টগ্রামবাসীরা এতে সম্পৃক্ত হয়। এর নেপথ্যে চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা ও অবদান অসামান্য। ১৮৯২ এবং ১৮৯৬ সালে পর পর দুবার চট্টগ্রামকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিপরীতে চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশনের অব্যাহত তীব্র সাংগঠনিক তৎপরতার ফলে সৃষ্ট বিপুল জনমত, ইংরেজদের পদক্ষেপকে প্রতিহত করে।

চট্টগ্রামের নলিনীকান্ত সেন ও তার বন্ধু-বান্ধবগণ গঠন করেছিলেন জাতীয় শিল্প-রক্ষিণী সমিতি। তাদেরই সাংগঠনিক উদ্যোগ ও একান্ত প্রচেষ্টার ফলে ১৮৯৫-১৮৯৬ সালে চট্টগ্রামের স্বদেশি বস্ত্রের কদর ও চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত স্বাধিকার আন্দোলনগুলোতে চট্টগ্রামবাসীর ভূমিকা ছিল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংগ্রামের।

১৯০১ সালে চট্টগ্রামকে আবার বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব ওঠে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামবাসী প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। দশ বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো এই সরকারি প্রচেষ্টার বিপরীতে সৃষ্ট আন্দোলনে চট্টগ্রামবাসীর সাথে যুক্ত হয় নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ত্রিপুরার অধিবাসীরাও। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ-ব্যাপক ও এই আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত হয় 'চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলন' নামে রাজনৈতিক সংস্থার। ১৯০৩ সালে ১৩-১৪ই মার্চ এবং ১৯১৪ সালের ১৭ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ আবারও প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়; বঙ্গভঙ্গ ও চট্টগ্রামকে আসামের সাথে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আয়োজিত এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সামুদ্রিক জোয়ারতুল্য এবং তেজোদীপ্ত উদ্দীপনাপূর্ণ জনগোষ্ঠী। ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে প্রতিবাদ সম্বলিত স্মারকলিপি চট্টগ্রাম এবং কলকাতার বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করেন। অ্যাসোসিয়েশন-এর বিরুদ্ধে লর্ড কার্জনের

কাছে টেলিগ্রাম পাঠায়। স্বদেশি আন্দোলন শুরু হলে এই সম্পৃক্তি আরও গভীর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে রাউজানের কোয়েপাড়ায় 'যামিনী সেন চট্টল হিতসাধিনী সভা' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে এতে জড়িত ছিলেন কবি শশাঙ্ক মোহন সেন, কাজেম আলী, মহিম চন্দ্র দাস, বিপিনবিহারী চৌধুরী প্রমুখ। কবি শশাঙ্ক মোহন বাদে বাকি তিনজন শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করে স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারতে উৎসবের আয়োজন করেছিল। চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ সেই বিজয়োৎসব বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উৎসবের দিন জেলখানায় সরবরাহকৃত উন্নতমানের খাবার কয়েদিরা স্পর্শও করেনি। দরিদ্র জনগণও সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যের চাল, কাপড় চোপড় ইত্যাদি গ্রহণ করেনি। বিদ্যুৎ শ্রমিকদের অসহযোগিতায় উৎসব-উপলক্ষ্যে পরিকল্পিত আলোকসজ্জার আয়োজনও ব্যর্থ হয়। এই শান্তি-চুক্তি বর্জন-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামবাসীর বিদ্রোহেরই বহিঃপ্রকাশ। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও চট্টগ্রাম পালন করেছিল স্বীয় বিপ্লবাত্মক ভূমিকা।

এ আন্দোলনের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুলের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে। তারপর অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে। এসময় তারা রাজপথে সরব ছিল। যে এম সেন হলে ধর্মঘটরত ছাত্র এবং জনতার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সভাপতি ছিলেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। হলের কাছে স্থাপিত হয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতিষ্ঠান 'স্বরাজ সংঘ'। অন্যদিকে ঘাট ফরহাদ বেগে কমল সেনের বাড়িতে স্থাপিত হয় জেলা খেলাফত কমিটির অফিস। চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান বলে অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি সমকালের খিলাফত আন্দোলনের দিকেও সমভাবে আকৃষ্ট হয় এবং ব্যাপকভাবে এতে জড়িয়ে পড়ে। এজন্যেই হাজার হাজার আন্দোলনকারী কারাবরণেও পিছপা হয়নি। একই সময় গড়ে ওঠে 'মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি'। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং সৈয়দ আবদুস সুলতান এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাষণ প্রদানকালে সভার মধ্যেই চট্টগ্রাম কলেজের উপাধ্যক্ষসহ পিয়ন সারদা দে চাকরি ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর থেকে চট্টগ্রাম জেলায় ইংরেজ বিরোধিতা এবং স্বাধীনতা আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

সে বছর আরেক সভায় গোপন বিপ্লবী দলের সভাপতি হলেন সূর্য সেন আর সহ-সভাপতি হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। মাস্টারদা সূর্য সেন বিপ্লবী দলটির অনেক সদস্য যোগ দেন অসহযোগ আন্দোলনে। ১৯২০-২০২১ সালে চট্টগ্রামের রেল ধর্মঘট সে সময় রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

ইউরোপীয় মালিকানাধীন চা বাগানগুলোর শ্রমিকরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে ক্ষুব্ধ মালিকেরা তাদের হেনস্থা করতে নানা ব্যবস্থা নেয়। অসহায়, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে তাদের উপর গুলি চালানো হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনা ইতিহাসে 'চাঁদপুরের কুলিনিগ্রহ' নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম রেলওয়ে ধর্মঘট সারা বাংলাদেশে প্রচুর সাড়া জাগায় এমনকি বিদেশি কোম্পানির শ্রমিকরাও এতে সমর্থন জানায় এবং শহরে মিছিল করে।

চট্টগ্রামে মালিক কর্তৃক ধর্মঘটরত শ্রমিক-কর্মচারীদের হেনস্তার বিপরীতে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মো. সিরাজুল হক প্রমুখসহ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। দেশে জারিকৃত ১৪৪ ধারা অমান্য করলে

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনসহ অন্য নেতৃবৃন্দকেও আটক করা হয়। এর প্রতিবাদে বিস্তৃত এলাকায় বিপুল জনসমাগম ঘটে। তাদের ঐকান্তিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যতীন্দ্রমোহনের জামিন মঞ্জুর হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং চাঁদপুরসহ দেশের অন্যান্য স্থানে ইংরেজদের বর্বরতার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম গোপন বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হন। সূর্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী দলটি পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যায়ামাগার স্থাপনের মাধ্যমে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য সদস্য সংগ্রহের কৌশল গ্রহণ করা হয়। ব্যায়ামাগারের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের সচ্চরিত্র, সাহসী ও বুদ্ধিমান ছাত্রদের সংগ্রহ করে তাদের ভেতর থেকে নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলাই ছিল লক্ষ্য। পরবর্তীকালে সংগঠিত যুব বিদ্রোহের মধ্যে এই সদস্যদের বাস্তবায়নের সাফল্য প্রমাণিত। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদের যুদ্ধ এবং পরবর্তী বহু খণ্ডযুদ্ধে এসব ব্যায়ামাগারে প্রশিক্ষিত ছাত্র ও যুবক বিপ্লবীরাই ছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণদানকারী যোদ্ধা।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা তাদের সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থান, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সমন্বিতভাবে সংঘটনের পরিকল্পনা করেন। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলাকে কয়েকদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাখা গেলে এর একটা বিরাট প্রেরণা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে এই চিন্তা বিপ্লবী নেতৃত্বের মধ্যে সক্রিয় ছিল। এজন্য যদি বিপ্লবীদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাতেও অকুণ্ঠিতচিত্ত ছিলেন। এসব বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন প্রমুখ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অধিনায়ক ছিলেন সূর্য সেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আইরিশ রিপাবলিকান বিপ্লবীদের অনুসরণে তাদের সশস্ত্র দলের নামকরণ করেছিলেন 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'।

ব্রিটিশবিরোধী লড়াই-সংগ্রামের অগ্নিযুগের বীর পুরুষ মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর সন্তানরা পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল ১৯৩০ সালে। দেশপ্রেমের বীরত্বপূর্ণ সেই আত্মত্যাগে দেশ ও জাতির জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল বীর চট্টলা।

১৯৩০ সালের ১৮ থেকে ২১শে এপ্রিল তিন দিন চট্টগ্রাম ছিল স্বাধীন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত। চট্টগ্রামে ওই তিন দিন ব্রিটিশের পতাকার পরিবর্তে উড়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা। একইভাবে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ-পরবর্তী তিন দিন হানাদার পাকিস্তানি জান্তামুক্ত ছিল চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের সর্বত্র উড়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র-সংবলিত জাতীয় পতাকা। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের দুই পর্বের এই সাদৃশ্য চট্টগ্রামের জন্য যেমন গৌরবের, তেমনি গৌরবের পুরো দেশের জন্যও।

১৯৩০ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড়ে, জুলধা, চন্দননগর ও ধলঘাটের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অবিস্মরণীয় স্মারক। সূর্য সেন তার বন্ধু অনুপম সেন, নগেন সেন, অম্বিকা চক্রবর্তীকে নিয়ে গড়ে তোলেন স্বদেশি বিপ্লবী দল।

চট্টগ্রামের ব্রিটিশদের সব ঘাঁটি বিপ্লবীদের দখলে চলে আসে। এভাবে এক দুর্দম সাহসের পরিচয়বাহী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামের এই গৌরবজনক অধ্যায় রচিত হয়। তবে পরবর্তীকালে বিদ্রোহীদের সাথে বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্য কালারপোল ও ধলঘাটের যুদ্ধ। ইউরোপিয়ানদের ক্লাবে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। তবে এবার এই কাজে ব্যবহৃত হয় নারী নেতৃত্ব। সর্বশেষ এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেন বীর বাঙালি নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তিনি উক্ত ঘটনার শেষ দিকে আহত অবস্থায় ইংরেজ সৈন্যের পাল্টা আক্রমণের মুখে অন্য সকল বিপ্লবীকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। পরবর্তী সময়ে ক্রমেই বিদ্রোহীরা ধরা পড়েন এবং বিচারে তাদের দ্বীপান্তর করা হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের এই স্মরণীয় এবং সফল বিদ্রোহের নেতা সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তকে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসি দিয়ে তাদের মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে

সলিলসমাধি দেওয়া হয়। সূর্য সেন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের ফাঁসি, কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তরের পর বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড স্তিমিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের এই যুব বিদ্রোহ বাঙালিদের, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্তে এক অনন্যসাধারণ এবং উদ্দীপনা সঞ্চারী ঐতিহ্য সৃষ্টি করে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামে ছিল পাইওনিয়ার সেনা দলের ক্যাম্প। ১৯৪৫ সালের দিকে এই ক্যাম্পের কিছু সৈন্যের অনৈতিক ও মন্দ আচরণে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কাহারপাড়া এলাকায় নারীদের অশালীনভাবে উত্তপ্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাইওনিয়ার ফোর্সের সৈন্যরা সদলবলে এসে অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতন, জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এই অমানবিক ঘটনায় ক্ষুব্ধ চট্টগ্রামবাসী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন দল, হিন্দু মহাসভা, জেলা ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিস্ট পার্টি, এলাকার আপামোর জনসাধারণ–সবাই সম্মিলিত আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। একটি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠে এবং পরদিন প্রতিবাদ মিছিলসহ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত হয়।

এই গণ-অসন্তোষজনক পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম শহরকে সেনা সদস্যদের অবারিত চলাচল বহির্ভূত ঘোষণা প্রদান করেন। দায়ী সেনা সদস্যদের বিচার ও শাস্তি হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে এবং ভারত বিভাগের পূর্বে চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এমন বিশাল ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরে আর হয়নি (পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ১৩৯৭: ৩০৫-৬, *চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস, সংগ্রামের নোটবুক*)।

বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাসে চট্টগ্রামের অবদান কম নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পথিকৃতের ভূমিকায় রয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনের ওপর আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথম গ্রন্থ– পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু। নতুন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি সংবলিত এই পুস্তিকাটি প্রকাশনার উদ্যোগ নেন চট্টগ্রামেরই সন্তান অধ্যাপক আবুল কাশেম। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, বাংলা ভাষাই হবে– 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ও অফিসাদির ভাষা' (*আজাদী: ১৯৯৫: ৩৯, চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস, সংগ্রামের নোটবুক*)।

১৯৪৮ সালে ১১ই মার্চ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং তৎকালীন পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা করার দাবিতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা বের করে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করেন। এরই প্রেক্ষিতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে এক সর্বদলীয় সভা আহ্বান এবং সেখানে সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের আলোচনাক্রমে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

আন্দোলনের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চট্টগ্রামে ২২শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হয়। চট্টগ্রামের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মাহবুল-উল-আলম ঢাকায় ছাত্রদের উপর নির্যাতন ও হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা শুনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় একটি কবিতার রচনা করেন এবং কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে রাতারাতি তা মুদ্রিত হয়। এই ঘটনাটি আমাদের ভাষা আন্দোলনের গতিপ্রবাহে এক ঐতিহাসিক সংযোজন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক,

সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে চট্টগ্রামও গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সংগ্রামী চেতনা ও ঐতিহ্যের এই ধারাবাহিকতায় এসে উপনীত হয় বাঙালির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও ঐতিহাসিক বছর ১৯৭১। এই মহত্তম বছরেও চট্টগ্রাম তার ঐতিহ্যগত সাহসী ও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। মার্চ মাসে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সশস্ত্র প্রস্তুতি পর্বে চট্টগ্রামবাসীও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রামে অবস্থানরত বাঙালি সেনা অফিসারবৃন্দও অত্যাসন্ন সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকেন। তবে এই মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সুপরিকল্পিত কূট উদ্দেশ্য সাধনে 'সোয়াত' নামের জাহাজে আনা অস্ত্রশস্ত্র নামানোকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের আপামর শ্রমিক জনতার সমন্বিত রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র জনযুদ্ধের সূচনা লগ্নে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই ঘটনায় ২০ জন নিহত হন। আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে লাঠি, বর্শা বন্দুকধারী লড়াকু শ্রমিক জনতার সে প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন প্রায় ২৫ হাজার মানুষ, (*আজাদী ১৯৯৫ :৪৬, চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস, সংগ্রামের নোটবুক*)।

স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ অকুতোভয় হাজারো জনতা ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক নৃশংসতা শুরুর পূর্বে অস্ত্র খালাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ এবং রক্তে রঞ্জিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এর পাশাপাশি সেই কাল রাতে ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন রফিক এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়া পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র অধ্যায়ের সূচনা করেন। ২৬শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা সমভিব্যাহারে প্রশিক্ষিত সৈন্যের কনভেনশনাল পদ্ধতিতে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় এখান থেকেই। সে রাত থেকেই বৃহত্তর চট্টগ্রামের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এই প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, ১৯৭১ সালের ২রা মে পর্যন্ত।

স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রামের অন্যতম দুটো শ্রেষ্ঠ ঘটনার একটি, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার (*বাংলাপিডিয়া : খণ্ড ৮, ২০০৩:২০৫*) এবং অন্যটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করণ (*বাংলাপিডিয়া : খণ্ড, ১০, ২০০৩: ২১৫, চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস, সংগ্রামের নোটবুক*)। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম তার ঐতিহ্যবাহী সাহসী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছিল।

অতীতের সব আন্দোলনের মতো ২০২৪ সালের জুলাইয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গর্জে উঠেছিল বীর চট্টলা। জুনের শুরু থেকে শুরু-হওয়া আন্দোলন ধীরে ধীরে রূপ নেয় গণ-আন্দোলনে। পরে তা গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। দুর্বার আন্দোলনে বিজয় হয় ছাত্র-জনতার।

ড. শিল্পী ভদ্র: লেখক ও ফেলোশিপ গবেষক, drdeepika091@ gmail.com

ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন

জাপানের কানসাই-এর ওসাকায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপো ২০২৫-এর বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন যৌথভাবে উদ্বোধন করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহিম খান ও টোকিওতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী। ১১ই এপ্রিল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আব্দুর রহিম খান বলেন, ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে রপ্তানি পণ্যের প্রদর্শন বিশ্বব্যাপী আমাদের দেশের ব্যাপক পরিচিতি এনে দিবে এবং আমাদের দেশের পণ্যের প্রতি বিদেশি ক্রেতারা আরো বেশি আকৃষ্ট হবে।

প্যাভিলিয়ন উদ্বোধনকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও জাপানের বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে তারা বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং প্রস্তুতি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

ছয় মাসব্যাপী বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এক্সপোতে বিশ্বের ১৬৫টি দেশ অংশ নেয়। দেশগুলোর ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের জন্য ওয়ার্ল্ড এক্সপো অপূর্ব সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হবে বলে আয়োজকরা ধারণা করেন। ১২ই এপ্রিল ওয়ার্ল্ড এক্সপো ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

প্রতিবেদন: ফয়সাল আহমেদ

কোটা সংস্কার ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে চট্টগ্রামে গণপদযাত্রা

কোটা বৈষম্যের যৌক্তিক সংস্কার করে সংসদে আইন পাসের লক্ষ্যে জরুরি অধিবেশন আহ্বান ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোটা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অভিমুখে গণপদযাত্রা শুরু করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

১৪ই জুলাই রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় ষোলশহর স্টেশনে শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে বেলা এগারোটায় গণপদযাত্রা শুরু করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চবি অধিভুক্ত কলেজ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাজারো শিক্ষার্থী এই গণপদযাত্রায় অংশ নেন।

'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'- এর ব্যানারে আয়োজিত গণপদযাত্রাটি ষোলশহর স্টেশন থেকে ২ নং গেট, জিইসি, লালখান বাজার, লাভলেইন হয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যায় এবং সেখানে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চবি সমন্বয়ক মশিউর রহমান বলেন, কোটা বৈষম্য নিরসন করে সংসদে আইন পাসের লক্ষ্যে জরুরি অধিবেশন আহ্বান ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অভিমুখে গণপদযাত্রা করছি। আমরা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেব। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরব না।

এসময় শিক্ষার্থীদের হাতে কোটাবিরোধী বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। 'কোটা না মেধা—মেধা মেধা'; 'আপোশ না সংগ্রাম—সংগ্রাম সংগ্রাম'; 'বঙ্গবন্ধুর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'আমার ভাই আহত কেন, প্রশাসন জবাব চাই'; 'কোটাপ্রথা নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক'; 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটাপ্রথার কবর দে'; 'আমার সোনার বাংলায়-বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে'– ইত্যাদি স্লোগান দেন।

[সূত্র: দৈনিক আজাদী, ১৪ই জুলাই ২০২৪]

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক ও রেলপথ অবরোধ আইআইইউসি শিক্ষার্থীদের

কোটা সংস্কারের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইআইইউসি) শিক্ষার্থীরা। এতে মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে গাড়ি ধীর গতিতে চলাচল করলেও সারাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় চট্টগ্রামের।

১৬ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সীতাকুণ্ডের কুমিরস্থ আইআইইউসি ক্যাম্পাসের সামনের সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনকারীরা জানান, সারাদেশে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ ও কোটা সংস্কার দাবিতে তাদের এ আন্দোলন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১০টার দিকে আইআইইউসি ক্যাম্পাসের ভেতরে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। পরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেন অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এতে চট্টগ্রামমুখী লেনে ২০ কিলোমিটারের বেশি যানজট সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সীতাকুণ্ড মডেল থানার পুলিশ। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে অবস্থান করছেন।

বারো আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খোকন চন্দ্র ঘোষ বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লাইনে অবস্থান নিয়েছে আইআইইউসি শিক্ষার্থীরা। এতে ২০ কিলোমিটারের অধিক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন যাত্রী সাধারণ। সীতাকুণ্ড রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার নিজামুদ্দিন বলেন, রেলপথ অবরোধের ফলে সকাল ১১টা থেকে সারাদেশের সঙ্গে চট্টগ্রামে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

[সূত্র: সমকাল, ১৬ই জুলাই ২০২৪]

ফেনীতে মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়কদের মুক্তি, মামলা প্রত্যাহারসহ নয় দফা দাবিতে ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ২৯শে জুলাই সোমবার শহরের রামপুর এলাকায় এ বিক্ষোভ করে তারা। এসময় মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে দুই কিলোমিটার এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

নয় দফা দাবিতে বিকেলে শহরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি রামপুর লাতু মিয়া সড়ক হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গিয়ে শেষ হয়। তারা মহাসড়ক অবরোধ করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

রিয়াদ হোসেন নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে গত কয়েকদিন শিক্ষার্থীদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তা অবর্ণনীয়। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা বাধা ও হামলা করে। সর্বশেষ ২৮শে জুলাই রবিবার আন্দোলনের সমন্বয়কদের জিম্মি করে মিথ্যা বিবৃতি আদায় করা হয়েছে। যা অত্যন্ত নিন্দাজনক।

ফাহিম নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের যৌক্তিক দাবি আদায়ে অনেক শিক্ষার্থী প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের হত্যাকারীদের সঙ্গে আমাদের কোনো আপোশ নেই।

এ ব্যাপারে ফেনী মডেল থানা-পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) মুশফিকুর রহমান *আজকের পত্রিকাকে* বলেন, তারা কিছুক্ষণ মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছিল। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গেলে মহাসড়ক থেকে সরে যান। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

[সূত্র: আজকের পত্রিকা, ২৯শে জুলাই ২০২৪]

৯ দফা দাবিতে নোয়াখালীতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

৯ দফা দাবি আদায়ে নোয়াখালীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে শিক্ষার্থীরা। ৩১শে জুলাই বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা শহর মাইজদী বাজার এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। মিছিলটি নোয়াখালী-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়ক, জেলা প্রশাসক কার্যালয়সহ, শিল্পকলা একাডেমি, চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় সড়ক, নোয়াখালী প্রেসক্লাব ও জেলা জজকোর্ট সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জজকোর্টের সামনে এক সমাবেশ করেন।

এতে বক্তব্য রাখেন নোবিপ্রবি শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান, বনি আমিন, আরিফুর রহমানসহ নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী আব্দুল মালেক উকিল সরকারি মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ, চৌমুহনী সরকারি এসএ কলেজ, চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বেসরকারি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বক্তারা নয় দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান। দাবি মানা না হলে তারা কঠোর আন্দোলনের হুমকি দেন। এসময় নোয়াখালী পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে কয়েকশো পুলিশ বিভিন্ন সড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে অবস্থান করে। নোয়াখালী পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান বলেন শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন শেষে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে গেছে। পুলিশি তৎপরতার কারণে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার ঘটেনি।

[সূত্র: সমকাল, ৩১শে জুলাই ২০২৪]

শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার ও ‘গণহত্যার’ প্রতিবাদে চবি শিক্ষকদের মানববন্ধন

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, গণহত্যা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষকরা। দুটি আলাদা ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। ‘নিপীড়নবিরোধী শিক্ষকসমাজ’ ও ‘নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক ঐক্য’– এই দুই ব্যানারে কর্মসূচি পালন করেন তারা। এসময় নিহত ছাত্র ও জনগণের হত্যার যথাযথ বিচার দাবি করেন তারা।

৩১শে জুলাই বুধবার দুপুর ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদমিনারে ‘নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক ঐক্য’-এর ব্যানারে মানববন্ধন করেন প্রায় অর্ধশত শিক্ষক। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদেরকে হত্যা, গ্রেপ্তার ও হয়রানির প্রতিবাদ জানান তারা। এসময় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র ‘গণহত্যা’ চালিয়েছে দাবি করেন শিক্ষকরা। গ্রেপ্তারকৃত সকল শিক্ষার্থীর মুক্তি ও হয়রানি বন্ধের দাবি জানান তারা। আন্দোলন শেষে র‍্যালি নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন শিক্ষকরা।

আন্দোলনে সঞ্চালনা বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ বলেন, শিক্ষার্থীদের এমন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ মানবিক হয়ে উঠেছিল। আর সেই আন্দোলনে এভাবে নির্বিচারে গুলি করেছে কারা? তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতে করতে হবে। এই আন্দোলনে এই শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ দেখে আমি অভিভূত। এখন থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষকরা শিখব।

যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শহীদুল হক বলেন, নিরাপত্তা শুধু পুলিশ বাহিনীর জন্য নয়, একজন রিকশাওয়ালার জীবনও সাংবিধানিকভাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ছাত্ররা তো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিল। তাহলে কেন তাদের ‘রাজাকার’ ডাকা হলো। কেন তাদের গুলি করা হলো। তারা তো এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীন দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন সিদ্দিকী বলেন, যে বর্বরতা হয়েছে সেটি এই প্রজন্মও দেখেনি, এর আগের প্রজন্মও দেখেনি। আমাদের আয়করের পয়সায় পরিচালিত বাহিনীকে গুলি চালানোর হুকুম কারা দিয়েছে আমরা শিক্ষকসমাজ এর উত্তর চাই। হাজার হাজার শিক্ষার্থী মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। রাষ্ট্রের প্রধান সেখানে গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো কার নির্দেশে আমার সন্তান আজ নেই। প্রতিটি হত্যার নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে।

ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, মোহাম্মদ আবুল বশর প্রমুখ।

মানববন্ধন শেষে ওই শিক্ষকেরা একটি মৌন মিছিল করেন। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদমিনার থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এদিকে দুপুর ১২টায় মানববন্ধন করেন 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষকসমাজ'। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ ও গ্রেপ্তারকৃত সকল শিক্ষার্থীদের মুক্তি দাবি করে প্রতিবাদ জানান তারা।

আন্দোলনে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক জি এইচ হাবীব বলেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর একটি দেশে শিক্ষার্থীদের ছোটো একটি দাবিকে রাষ্ট্র এত মর্মান্তিক ও ভয়ানক পর্যায়ে কীভাবে টেনে নিলো। রাষ্ট্রের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে যে পরিণতি হলো তার কারণে আমাদের এখানে দাঁড়াতে হয়েছে। আমাদের ছাত্র ও গণমানুষকে হত্যা করা হয়েছে, গণগ্রেপ্তার চলছে– এসব হয়রানির প্রতিবাদ জানাতে দাঁড়িয়েছি।

যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সায়মা আলম বলেন, এতগুলো প্রাণ যে ঝরে গেল কোনো মূল্যেই তাদের ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই এই হত্যাকাণ্ডের কোনো ক্ষমা নাই। এখন যে গণগ্রেপ্তার চলছে, বিনা অভিযোগে বেআইনিভাবে ছাত্রদের আটক করা হচ্ছে, আমরা তার প্রতিবাদ জানাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মুক্তি দাবি করছি।

প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, ২১১টি প্রাণের ক্ষতি স্থাপনা ধ্বংসের ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি। রাষ্ট্রের স্থাপনা নিয়ে কথা বললে আমরা প্রাণের বিষয়ে কথা বলছি না। এখনো যারা নিরাপত্তা হেফজতে রয়েছে, জেলে রয়েছে, নজরদারিতে রয়েছে– সবাইকে রাষ্ট্রীয় আইন মেনে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া উচিত। স্বাভাবিক নিয়মে নিরাপত্তার সহিত শিক্ষাঙ্গন খুলে দেওয়া উচিত। এছাড়াও এই কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শামীমা ফেরদৌসী, মো. ইমাম হোসাইন, মো. কামাল উদ্দিন, খাদিজা মিতু, মো. শফিকুল ইসলাম, মুনমুন নেছা চোধুরী, ফারজানা আহমেদ, ও স্থানীয় বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক।

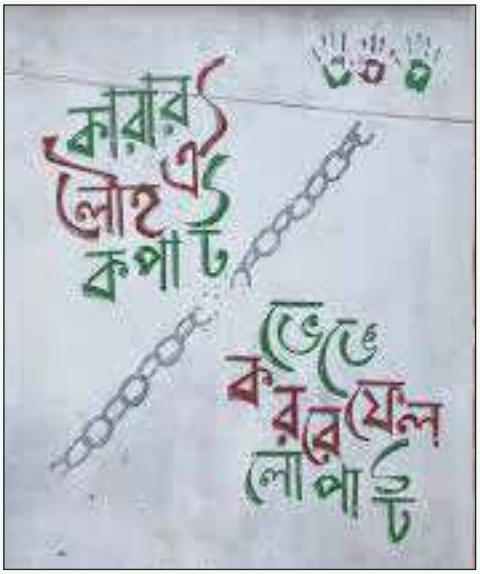

[সূত্র: সমকাল, ৩১শে জুলাই ২০২৪]

'দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ'-এর আবেদন শতভাগ অনলাইনে

এখন থেকে 'দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ'-এর আবেদন শতভাগ অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। ৪ঠা মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন আগামী ১৫ই মে ২০২৫ তারিখ থেকে সরাসরি হার্ডকপিতে (অফলাইনে) গ্রহণ করা হবে না। সেবা দিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং দ্রুততম সময়ে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১৬ই মে ২০২৫ তারিখ থেকে দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের আবেদন শতভাগ অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, scs.ssd.gov.bd লিংক-এ নিজস্ব gmail আইডি দিয়ে Login করে অনলাইনে ফরম পূরণ, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আপলোড ও ই-পেমেন্টের মাধ্যমে সরকারি ফি পরিশোধ করে আবেদন করা যাবে। আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তির পর ডিজিটাল সনদ আবেদনকারী ই-মেইলে প্রাপ্ত হবেন এবং নিজস্ব gmail আইডি থেকে QR Code সংবলিত ডিজিটাল সনদ ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। গত ২৯শে এপ্রিল বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের বহিরাগমন-৩ শাখার উপসচিব আলীমুন রাজীব।

প্রতিবেদন: রিপন আহমেদ

প্রতিটা মেয়েই হয়ে উঠুক স্ফুলিঙ্গ

রহিমা আক্তার মৌ

আমি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন দেখিনি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি। তবে আমি ২০২৪ সালকে দেখেছি বাংলাদেশের রাজধানীর মধ্যখানে বসবাস করে। আমি দেখেছি, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কীভাবে কোটা সংস্কার আন্দোলনে রাজপথে নিজের জীবন বাজি রেখেছে। আমি দেখেছি, স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী কীভাবে রাস্তায় নেমেছে অধিকার আদায়ে, বড়ো ভাইবোনদের পাশে সংখ্যা বাড়াতে, সাহস দিতে। আমি দেখেছি, শ্রমিক কীভাবে সহায়তা করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে। দেখেছি সব শ্রেণিভেদ ভুলে অভিভাবকরা সন্তানদের রাজপথে নামিয়ে দিতে। সন্তানদের পাশে ঢাল হয়ে সাহস দিতে। দেখেছি বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে। এই যে এত কিছু দেখেছি কোথাও কিন্তু নারী-পুরুষের বৈষম্য দেখিনি।

আমি জেনেছি ১৯৫২ সালে নারীরা কতটা এগিয়ে ছিল ভাষা আন্দোলনে। আমি জানতে পেরেছি ১৯৭১ সালে নারীদের আত্মকথা। শুনেছি দেশের জন্য কতটা বিসর্জন দিতে পারে নারীরা। আমি দেখেছি, সবকিছু ভুলে সহপাঠীকে বাঁচাতে কীভাবে এগিয়ে এসেছে সহপাঠী। কতটা নিষ্ঠুরতম ছিল ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট। ওদের মুখের কথাগুলো শুনে শিউরে উঠেছি। তাদের একজন হলেন চট্টগ্রামের সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের শিক্ষার্থী নীলা আফরোজ।

২০০১ সালের ১৪ই মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নীলা আফরোজ। মা কোহিনূর বেগম একজন গৃহিণী আর বাবা জহিরুল হক একজন নেভি অফিসার। বাবা-মায়ের তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মাঝে নীলা আফরোজ সবার ছোটো। তার বেড়ে ওঠা ও লেখাপড়া চট্টগ্রামেই। ২০১৭ সালে দক্ষিণ হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ থেকে ২০১৯ সালে এইচএসসি পাস করেন। এরপর ভর্তি হন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয়। জানতে পারি জুলাই-আগস্টের অনেক বিষয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিয়ে নীলা আফরোজ বলেন, 'আমাকে যা খুব বেশি স্পর্শ করে তা হলো কোনো শিশু এবং নারীর প্রতি অন্যায়। জুলাইয়ের ১৫ তারিখ ঢাকায় যখন হামলা হয়

দেখলাম চশমা পরা একটা মেয়ে এক কোণায় রক্তাক্ত অবস্থায় ভীত সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই দৃশ্য দেখার পরে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। তাই ১৬ই জুলাই থেকে আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং করিও তাই। ১৬ তারিখ বাসা থেকে বের হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম তখন গোলাগুলির আওয়াজ শুনি। রুমমেটেরা নিষেধ করা সত্ত্বেও বাসা থেকে বের হয়ে চলে যাই। রাস্তায় এলাকার যতজনই দেখেছে সবাই বলল বাসায় চলে যেতে কিন্তু আমি যাইনি। আমার মাথায় ঘুরছিল ওরা প্রত্যেকে আবরার ফাহাদ। আমি যদি একজন আবরারকেও বাঁচাতে পারি সেটাই আমার সাফল্য। করলামও ঠিক তাই।

হামলাকারীরা ছাত্রদেরকে একা পেয়ে মোবাইল চেক করছিল এবং তাদেরকে মারধর করছিল। কয়েকজনকে বাঁচালাম। হামলাকারীরা সবাই পকেটে করে মোবাইলের আকারের দেশীয় অস্ত্র রেখেছিল অতর্কিত হামলা করার জন্য। তারপর কয়েকজনকে ফার্স্ট এইড ব্যবস্থা দেওয়ার পরে দেখলাম একটা মেয়ে সন্ত্রাসীদের একজনের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত আছে। সে প্রশ্ন করছে, আপনারা কেন ছাত্রদেরকে মারছেন। বুঝলাম তারও বিপদ হতে পারে, তখনো জানতাম না সে চট্টগ্রামের জেলা সমন্বয়ক পুষ্পিতা নাথ। পরে সে ছাত্রলীগের ডেরায় চলে গেল, সাথে আমিও গেলাম। তার উপর হামলা করার চেষ্টা চালানো দু-তিন জনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলাম। সেখানে আহতও হয়েছিলাম। এটা ছিল ২নং গেইট মোড়ের ঘটনা। তারপর শুনলাম মুরাদপুর ছাত্রদের দখলে। ৮ জন মেয়ে জোগাড় করে রওনা দিলাম মুরাদপুর। ততক্ষণে মুরাদপুর রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছে। পুলিশ কাউকে মুভ করতে দিচ্ছে না। ভ্যানে করে দেখলাম কিছু আহত ভাইদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং আমাদের পেছনেও কিছু সন্ত্রাসী গোয়েন্দা কাজ করছিল। সেদিন বাসায় চলে আসি।'

সমন্বয়কদের দিক নির্দেশনা ও তুমুল আন্দোলন নিয়ে নীলা বলেন, "১৭ তারিখের প্রোগ্রামের জন্য অনলাইনে সমন্বয়কদের মিটিং করা হয় সেখানে আমিও যুক্ত থাকি। সিদ্ধান্ত আসে ঐতিহাসিক লালদিঘী ময়দানে শহিদদের গায়েবানা জানাজা কর্মসূচি রাখা হবে। সেদিন আমাকে চকবাজারেই আটকে দেয়। আগেই জানতাম আমাদের সিনিয়রদের একাংশ প্রেস ক্লাবের সামনে উদ্বিগ্ন নাগরিকবৃন্দের ভূমিকায় একটা কর্মসূচি রেখেছে। তখন আমি বললাম, 'আমি বাতিঘর যাবো আমার কিছু বই লাগবে'। পরে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। এরপর শান্তিপূর্ণভাবে আমরা জামালখান প্রেস ক্লাব থেকে আমাদের কর্মসূচি শেষ করে একটা প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব থেকে আন্দরকিল্লা গিয়ে শেষ করে দেই।

১৮ই জুলাই কেন্দ্র থেকে ঘোষণা আসে বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হবে, তার প্রেক্ষিতে স্থান নির্ধারণ করা হয় নতুন ব্রিজ। যথা সময়ে পৌঁছে যাই এবং কর্মসূচি শুরু হয়। সেদিন পুলিশ শুরু থেকেই বাধা দেওয়ার একটা চেষ্টা চালায় তবে মেয়েদের বলয় পার করে যাওয়ার সাধ্য তাদের হয়নি। এরপর পেছনে গিয়ে তারা আমার ভাইদের উপর হামলা করে। সেদিন প্রথম টিয়ারশেলের সাথে পরিচিত হই। পুরো শরীর যেন জ্বলে যাচ্ছিল, নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। সেদিন থেকেই সারা বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউট এবং কারফিউ শুরু হয়। কেন জানি না তখন মনে হচ্ছিল এই দেশ আবার স্বাধীন হবে। বস্তুত তখন এটাকে ওভারথিংকিং হিসেবেই ধরতাম।

ইন্টারনেট বন্ধ করে কারফিউ দেওয়া ছিল তখন সরকারের অনেক বড়ো একটা রাজনৈতিক কৌশল। যে দেশকে ডিজিটাল দেশ বলে, সেবাসমূহ ডিজিটাল করে প্রশংসা নিয়েছে তারা, সেই তারাই তাদের রাজনীতির প্রত্যক্ষ খেলা দেখালো ইন্টারনেট বন্ধ করে কারফিউ দিয়ে। বাঙালি জাতি যে '৪৭, '৫২, '৬৯, '৭১ ও '৯০ সাল দেখে এসেছে তা হয়ত তারা ভুলেই গিয়েছে। দেশের সবকিছু নির্ভরশীল ছিল ইন্টারনেটের সাথে, বাধ্য হয়ে ইন্টারনেট চালু করেছে। এই কয়েকদিনে কোথায় কী হয়েছে তা তখন মানুষ জানতে বা দেখতে না পারলেও ইন্টারনেট আসার পর আর ৫ই আগস্টের পর সবই জানতে পারে।"

ইন্টারনেট বিহীন সময় আর আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে নীলা আফরোজ বলেন, 'এরপরের দিনগুলো না ঠিকমতো খেতে পেরেছি না ঘুমাতে পেরেছি। খেতে বসলে মনে হতো রক্ত হাতে লেগে আছে, ঘুমাতে গেলেও চোখে রক্ত দেখতাম। এরপর প্রায় ১০ দিন কীভাবে গিয়েছে জানি না। ফোনের নেটওয়ার্ক দিয়ে শুধু কল করা যায়। কল দিয়ে এদিক-সেদিক থেকে খোঁজখবর নিতাম সবাই কেমন

আছে, সেইফ আছে কি না। জীবনের সবচাইতে বীভৎস দিনগুলো ছিল ১৮ই জুলাই থেকে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত। ২৮শে জুলাই একটু একটু ব্রডব্যান্ড নেট আসে, অনলাইন মিটিং করা হয় এবং জামালখান প্রেস ক্লাবে প্রতিবাদ সমাবেশ রাখা হয়। সেদিন আমাদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম কারণ পুলিশ প্রতিটা পয়েন্টে ফোন চেক করছিল এবং জড়ো হতে দিচ্ছিল না। আমি বার বার ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম কে কোথায় আছে। সবাইকে নাস্তার দোকানগুলোতে বসে চা খেতে বলছিলাম। হঠাৎ

করে ঈশা আমাদের মেয়েদের গ্রুপে মেসেজ দিয়ে বলল যে তারা চেরাগী মোড়ে জড়ো হয়েছে, আমিও বললাম যে যেখানে আছি তাদের সাথে একত্রিত হই।

সেদিন বড়োজোর ৭৫ জন ছিলাম আমরা, যার মধ্যে ৬০ জন শুধু মেয়ে-ই ছিল। আমরা কর্মসূচি পালনকালে আমাদের ওপর যুবলীগ হামলা করে আমাদের প্ল্যাকার্ড ছিনিয়ে নেয় এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। সেদিন পুলিশ প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়ক রিদুয়ান সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তার করার পায়তারা করছে বুঝতে পেরে আমি পেছনের সারি থেকে সামনে এসে আমার বোনদেরকে নিয়ে মানবপ্রাচীর তৈরি করি এবং তাকে গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বাঁচাই। তারপর প্রিজন ভ্যানে আমাদের দুজন ভাইকে তুলে ফেলা হয় এবং আমরা তাদেরকে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করি এবং একজনকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হই। আমার যদি ভুল না হয় তাহলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আমরাই প্রথম পুলিশের কাছ থেকে তাদের ক্লেইম করা কোনো আসামিকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি।'

১৮ই জুলাই চট্টগ্রামের নতুন ব্রিজ এলাকার বাংলা ব্লকেড কর্মসূচিতে অংশ নেন নীলা আফরোজ। তিনি বলেন, 'সেদিন পুলিশ বলছিল 'এখানে দাঁড়ানো যাবে না, চলে যান'। আমরা বলেছিলাম, 'যেহেতু দাঁড়ানো যাবে না আমরা এখানে বসব'। তারপর পতাকা হাতে স্লোগান দিচ্ছিলাম– 'আবু সাঈদ মরলো কেন? প্রশাসন জবাব দে'; 'আমার ভাই কবরে খুনি কেন বাহিরে?' এবং পুলিশ যখনই এগিয়ে আসছিল আমরা 'ওয়াসিম শান্তর খুনি' বলে চিৎকার করছিলাম।"

রক্তাক্ত জুলাইয়ের দিনগুলো নিয়ে নীলা আফরোজ আরও বলেন, 'প্রথমে আমাদের আন্দোলন চলছিল ফুটপাত ঘেঁষে, কিন্তু তারা যখন আমাদের ভাইদেরকে নিয়ে গিয়েছিল তখন আমরা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তার মাঝে কর্মসূচি পরিচালনা করতে থাকি। ঠিক তখনি দেখলাম একটা সাউন্ড গ্রেনেড উড়ে আসছে। আমি সাথে সাথে সবাইকে অ্যালার্ট করে দিলাম এবং বললাম সবাইকে যেন বলে দেওয়া রাস্তা দিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। ততক্ষণে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে দিয়েছিল। আমি বসে থাকা আমার বোনগুলোকে ধরে ধরে উঠতে সাহায্য করি এবং বার বার বলতে থাকি দৌড়ে পালাও এবং নিরাপদ স্থানে যাও। ততক্ষণে অনেক টিয়ারশেল নিশ্বাসে মিশে গিয়েছে। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আমি পিজ্জাবার্গের বিল্ডিংটায় ঢুকতে গিয়ে প্রথম দফায় ব্যর্থ হই এবং দেখি পুলিশ গুলি নিয়ে এগিয়ে আসছে। তখনি মনে মনে কালিমা শাহাদাত পাঠ করে ফেলি এবং চোখ বন্ধ করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে ফেলি। মায়ের কথা তখন খুব মনে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল আর হয়ত মায়ের মুখটা দেখতে পারব না। ঠিক তখুনি পেছন থেকে গেইট খুলে কেও একজন আমাকে টেনে গেইটের ভেতরে ফেলে দিয়ে গেইট বন্ধ করে এবং সাথে সাথেই গেইটকে উদ্দেশ করে গুলি ছোড়া হয়। ওখানে প্রায় ৫-৬ মিনিট পড়ে থাকি। জ্ঞান ছিল তবে উঠে যাওয়ার শক্তি ছিল না, টিয়ারশেল এমনভাবে নিশ্বাসে মিশে যায় যে আমার শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। পরে আশপাশের মেয়েগুলো আমাকে পেস্ট লাগিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে তারপর বাসায় সেইফলি মুভ করি।

সেদিন অনেক বেশিই মিডিয়া কভারেজ থাকায় আমি ফোকাসে চলে আসি। বাসায় আসার পরে জানতে পারি আমাদের বাড়িওয়ালা আমাকে সেইফ জোনে চলে যাওয়ার জন্য বলেছে। তখনো বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাব। গিয়ে উঠলাম এক

আন্টির বাসায়। সেখানে থাকাকালীন সময়ে রাতে বাসা থেকে কল আসল আমি যেন বাড়িতে চলে যাই। পরের দিন আমাকে জোর করে আপুর বাসায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকেই ফ্যামিলির সাথে যুদ্ধ করে আন্দোলনে যুক্ত থাকি তবে এবার আর কারো সামনে আসি না। সবাইকে বলে দিয়েছিলাম আমি বাড়িতে চলে গিয়েছি। এরমধ্যে আমরা কোর্ট বিল্ডিং এবং নিউ মার্কেটসহ আরও অনেক স্থানে সফলভাবে কর্মসূচি পালন করতে থাকি এবং বিজয় ছিনিয়ে আনি ৩৬শে জুলাই তথা ৫ই আগস্ট। সেদিনই বুঝেছিলাম '৭১-এ আসলে কেন মানুষ মুক্তির জন্যে নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে সংগ্রাম করেছিল। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। এই ছিল আন্দোলনকে ঘিরে আমার অভিজ্ঞতা।'

২৯শে জুলাই চেরাগীর মোড় হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়, সেখানে অংশ নেন নীলা আফরোজ। তিনি বলেন, "পুলিশ বলছিল: 'সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। আপনারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলুন। এসেছেন, দাঁড়িয়েছেন, মিডিয়া কভারেজ পেয়েছেন– এখন বাসায় চলে যান'।

আমি উত্তর দিলাম: 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমরা মিডিয়ার ফোকাসে আসার জন্য এখানে এসেছি? কিংবা দাঁড়িয়েছি? কেন এতদিন যে চট্টগ্রামের আন্দোলনের স্পটগুলো মিডিয়া কভারেজ পায় নাই তার মানে কি চট্টগ্রামে আন্দোলন হয় নাই? নির্দিষ্ট সময়ের কথা যে বললেন, আপনারা কি নির্দিষ্ট সময় মেনে গুম-খুন-হত্যা করেছেন? আপনারা তো দিনে-রাতে যখন যেভাবে পারছেন গুম-খুন-হত্যা চলমান রেখেছেন। যে পোশাক পরে আছেন তাতে গোলামি এবং দালালির গন্ধ লেগে আছে। বিকট দুর্গন্ধ আসছে এই পোশাক থেকে, গোলামির জিঞ্জির ছেড়ে দালালির পোশাক খুলে আমাদের সাথে এসে দাঁড়ান। আমরা আপনাদেরই ছেলেমেয়ে, আমাদের শরীরের রক্ত মানে আপনার বাচ্চার শরীরের রক্ত।'

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিজের সাথে যেসব সহপাঠী ও ভাইবোনেরা অংশগ্রহণ করেন তাদের কয়েকজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে নীলা বলেন, 'জুলাই আমার কাছ থেকে কিছুই নিতে পারেনি তবে দিয়েছে অনেক কিছুই। যেমন ট্রমা, স্ট্রেস, ভাই হারানোর কষ্ট, ভয়, হুমকিসহ আরও অনেক কিছু। তবে সেই সাথে কিছু মানুষ পেয়েছি, তার মধ্যে সাইফুর রুদ্র ভাই, দিপা দিদি, রিপা দিদি, পুষ্পিতা, লাবনি, সিয়াম, আব্দুর রহমান, রিদুয়ান, রাসেল আহমেদ, শুভ, জুনায়েদ, তানজিদ, রাইয়ান রাফি, নাফিজা অমি, মিনহাজ রাফিসহ আরও অনেকেই বিশেষ করে আমার মেয়েগুলো সাদিয়া আপু, আফিয়া হাবিবা, ফাবিহা তান্নি, তানিয়া জেবিন, আনিকা ইশা, সুমাইয়া আপুসহ আরও অনেকেই। এরা প্রত্যেকে একেকটা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ছিল আন্দোলনের সময়টায়। একজন নেতিয়ে গেলে বাকিরা দাঁড়িয়ে যেত স্পৃহা হয়ে।'

বর্তমানে নীলা আফরোজ চট্টগ্রামে বসবাস করছেন, পড়াশোনার পাশাপাশি জবের প্রিপারেশন এবং সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছেন। জানি প্রত্যাশা

আর প্রাপ্তির মাঝে ব্যবধান অনেক, তবুও প্রত্যাশা আছে বলেই আমরা প্রাপ্তির খাতায় যোগ করতে পারি আমাদের বিজয়ের কথামালা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও আগামী নির্বাচিত সরকারের কাছে নীলা আফরোজ প্রত্যাশা সম্পর্কে বলেন, 'প্রত্যাশার কথা যদি কিছু বলতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে যেই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি সেই গণতন্ত্র সত্যিই মুক্তি পাক এবং গণতন্ত্রের রক্ষা হোক। দেশ এগিয়ে যাক, দুর্নীতি না থাকুক। দেশের মানুষ নিজেকে নিরাপদ মনে করুক। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক, স্বৈরাচার শাসনামলে নারীর উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র শেখ পরিবারের নারীদের উন্নয়ন দেখেছি। যেহেতু স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছি তাই আমার চাহিদা ফ্যাসিবাদ মুক্ত দেশে নারী উন্নয়ন বলতে কোনো নির্দিষ্ট পরিবার না হয়ে সারাদেশের নারীর উন্নয়ন হোক। দেশের প্রতিটা জায়গা, শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল, সমতল থেকে শুরু করে পাহাড়– প্রতিটা মেয়েই হয়ে উঠুক স্ফুলিঙ্গ।"

রহিমা আক্তার মৌ: সাহিত্যিক ও কলাম লেখক

‘সন্তান হত্যা’র বিচার দাবিতে চট্টগ্রামে রাজপথে মায়েরা

‘সন্তান হত্যা’র বিচার দাবিতে চট্টগ্রামে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন করেন সর্বস্তরের নারীরা। ভারী বৃষ্টি উপেক্ষা করে এসময় কর্মসূচিতে যোগ দেন হাজারও নারী ও অভিভাবক। এসময় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নির্বিচার হত্যা, হামলা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানান নারীসমাজ।

২রা জুলাই শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হতে থাকেন অভিভাবকরা। বিকেল পৌনে ৪টায় মানববন্ধন কর্মসূচি শুরু হয়। প্রতিবাদী নারীসমাজের ব্যানারে ‘শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের নির্বিচার হত্যা, হামলা, গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও সন্তান হত্যার বিচার দাবিতে মায়েরা রাজপথে’ শিরোনামে কর্মসূচি পালন করেন তারা। বিভিন্ন পেশার অভিভাবকরা কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন।

গান, নৃত্য, মাইম ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন অভিভাবক ও শিশুরা। বিকেল সাড়ে ৪টায় ‘শিক্ষার্থীদের পাশে মা’-এই ব্যানারে আরেক দল নারী এসে যোগদান করেন মানববন্ধনে। জনতার ঢলে চেরাগী মোড় থেকে জামাল খান রোড পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকে। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাব থেকে আন্দরকিল্লা হয়ে নিউ মার্কেট এলাকায় সন্ধ্যা ৬টায় কর্মসূচি শেষ হয়।

মানববন্ধন সঞ্চালনা করেন নারী মুক্তি কেন্দ্রের আসমা আক্তার। তিনি প্রতিবাদী নারীসমাজের সমন্বয়ক। মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ দেন গৃহিণী, নারী উদ্যোক্তা, ডাক্তার, ব্যাংকার ও সমাজকর্মীরা। নারীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে শিক্ষার্থী ও সর্বস্তরের পুরুষরাও যোগ দেয় মানববন্ধনে। এসময় অভিভাবকরা ‘হামার বেটা মারলু কেনে, জবাব চাই, জবাব চাই’; ‘আমার সন্তান মরলো কেন, বিচার চাই’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

মানববন্ধনে মাথায় পতাকা বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন সমাজকর্মী শাহীন শিরীণ। পাশে নিজের ছোটো শিশুর হাতে দিয়েছেন কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের ছবি। শাহীন শিরীণ *সমকালকে* বলেন, আমার সন্তান রক্তাক্ত হয়েছে মানে আমরাও রক্তাক্ত। এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের সন্তানদের গণকবর দেওয়া হয়। আমরা কার কাছে বিচার চাইব। এই রাষ্ট্রই তো আমাদের সন্তানকে হত্যা করেছে।

মানববন্ধনে মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন রিতু পারভিন। তিনি বলেন, দেশের কোন পরিস্থিতি হলে মায়েরা রাজপথে নামে? এত হত্যা আর গণগ্রেপ্তার হলো, তারপরেও এখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা আটক হয়েছে তাদের জেলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলছে। ওরা তো শিশু। আমাদের শিশুরা কেন বিনা অপরাধে জেলে পরীক্ষা দিবে? আমরা তাদের মুক্তি চাই।

আরেক অভিভাবক ফাতেমা আক্তার বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় কেনা অস্ত্র দিয়ে পুলিশ আমাদের সন্তানকে হত্যা করে। আমি বলতে চাই, আমাদের সন্তানকে না মেরে আমাদেরকে খুন করেন। ওরা আমাদের ভবিষ্যৎ। আপনারা আমাদের ভবিষ্যতকে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছেন। সরকারের প্রতি এই জুলুম বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।

[সূত্র: সমকাল, ২রা আগস্ট ২০২৪]

আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট মোড়

সারাদেশে ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হামলা করে খুনের প্রতিবাদ ও ৯ দফা দাবিতে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে'র ডাকে বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও পালিত হচ্ছে বিক্ষোভ কর্মসূচি। তাদের ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৩রা আগস্ট বিকেল ৩টা থেকে নগরীর নিউ মার্কেট মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন হাজার হাজার আন্দোলনকারী। এতে নিউ মার্কেটসহ আশপাশের এলাকা আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

৩রা আগস্ট শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ছোটো ছোটো মিছিল নিয়ে নগরীর নিউ মার্কেট মোড়ে জড়ো হতে থাকেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এতে শিক্ষকদেরও অংশ নিতে দেখা যায়। কিছু সময়ের মধ্যেই পুরো এলাকা আন্দোলনকারীদের দখলে চলে যায়। জমায়েত থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান আর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'সহ বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন তারা।

নিউ মার্কেট মোড়ে অদূরে ফুটপাতে রয়েছে পুলিশ বক্স। সড়কে রয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাও। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা এগুলো লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। এদিকে নগরীর জিপিও মোড়, সদরঘাট মোড়, স্টেশন রোড এবং আমতলা মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে আন্দোলনকারীরা নিউ মার্কেট মোড় অবরুদ্ধ করে রাখেন। নিউ মার্কেট মোড় ঘিরে ব্যস্ততম সড়কে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এতে পথচারী ও যাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বলেন, তাদের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন। দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত রাজপথেই অবস্থান করবেন বলে ঘোষণা দেন তারা।

[সূত্র: সমকাল, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

নগরে মানুষের বাঁধভাঙা উল্লাস

রাস্তায় ছাত্র-জনতার ঢল, সব পথ মিশেছিল কাজীর দেউড়িতে

দেশত্যাগী ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগে নগরীর পথে পথে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে বিজয় উল্লাস ও উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে। গত ৫ই আগস্ট সোমবার বিকেল ৩টার পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের খবর পেয়েই রাস্তায় নেমে এসে বিজয় উদ্‌যাপন করতে দেখা গেছে নারী-শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষকে। এসময় উল্লসিত মানুষকে নানা স্লোগান দিতে দেখা গেছে।

সবার মুখেই স্লোগান ছিল- 'পালাইছে রে পালাইছে, শেখ হাসিনা পালাইছে'; 'ছি ছি হাসিনা, লজ্জায় বাঁচি না'; 'হই হই রই রই ছাত্রলীগ গেল কই' ইত্যাদি। তাছাড়া পরিচিত-অপরিচিত সবাই একে অপরকে সালাম বিনিময়ের পর 'ঈদ মোবারক' বলে শুভেচ্ছা জানান। সোমবার যেন ঈদের দিন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিকেল ৩টার দিকে বিগত সরকার প্রধানের পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে যায় পুরো নগরীতে। সাথে সাথে নগরীর চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা থেকে শুরু হয় বিজয় মিছিল। অংশ নেন নারী-শিশুসহ হাজার হাজার মানুষ। আধাঘণ্টার মধ্যে বাকলিয়া নতুন ব্রিজ এলাকা, এক্সেস রোড, চকবাজার, চেরাগী, জামালখান বহদ্দারহাট মোড়ে সমবেত হন হাজার হাজার মানুষ। এরপর ছাত্র বিক্ষোভের সময় শহিদ শিক্ষার্থীদের স্মরণ করে বহদ্দারহাট ও মুরাদপুর হয়ে বিজয় মিছিল আগায় লালদিঘীর পথে। নগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এভাবেই খণ্ড খণ্ড বিজয় মিছিল এগোয় লালদিঘীর দিকে। নগরের সব পথ মিশে গেছে ওই ঐতিহাসিক ময়দানে। এছাড়াও বাসাবাড়ি থেকে যুবতী, নারী, বৃদ্ধারা পর্যন্ত অলিগলি থেকে শুরু করে সড়ক-মহাসড়কে উল্লাস করতে বের হয়েছেন। তাদের চোখে-মুখেও এক ধরনের স্বস্তির হাসি দেখা গেছে। যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে মাথায় জাতীয় পতাকা দিয়ে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পাশাপাশি সকল শিক্ষার্থীদের হাতে ও মাথায় পতাকা, স্লোগান

দিতে দেখা গেছে। বিকেল ৪টার দিকে নগরীর বহদ্দারহাট, মুরাদপুর, চকবাজার, জামালখান, চেরাগী পাহাড়, নিউ মার্কেট এলাকায় একজন অপরজনকে মিষ্টি খাইয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায়। এতে তারা ঈদের খুশি অনুভব করছেন বলেও জানান।

হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজের শিক্ষার্থী আলফাজ উদ্দিন বলেন, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তা আমরা দেখিনি, আজকে স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশ দেখলাম। আজ আমরা স্বাধীন। বিজয় আমাদের হয়েছে। আন্দোলনে শহিদ হওয়া আমাদের ভাইদের রক্ত কখনও বেইমানি করতে পারে না। তাদের মায়েদের বদদোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে।

মুরাদপুর এলাকার জামাল হোসেন মিষ্টি বিতরণ করার সময় বলেন, বিগত ১৭ বছর ধরে মানুষ কোনো কথা বলতে পারে না। আজকে মন হালকা

হচ্ছে। জাতির এই আনন্দ মুহূর্তে ছাত্রদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের আত্মত্যাগ ভোলা যাবে না। এ মিষ্টি খুশির, এ মিষ্টি আনন্দের।

বাকলিয়ার সৈয়দ শাহ রোডের ব্যবসায়ী খাইরুল ইসলাম বলেন, আহা কী আনন্দ আকাশে–বাতাসে। কী যে আনন্দ লাগছে বোঝাতে পারব না। এ বিজয় নির্যাতিত ছাত্র–জনতার। সন্ধ্যায় জামালখান মোড়ে জড়ো হওয়া মানুষ

'জিতেছে রে জিতেছে, ছাত্রসমাজ জিতেছে'; 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ'; 'ভুয়া ভুয়াসহ সরকার পতনের নানা স্লোগান দিতে থাকেন। এদিন সড়কে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়েছে। তাদের অনেকের হাতে ও মাথায় শোভা পাচ্ছিল বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা।

এর আগে বিকেল ৪টায় প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন বলে জানিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, এখন রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল চলছে। একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে। সব হত্যার বিচার হবে। সেনাবাহিনীর ওপর আস্থা রাখেন। আমরা রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। এর আগে বেলা আড়াইটায় বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টার শেখ হাসিনাকে নিয়ে যাত্রা করে। এসময় তার সঙ্গে তার ছোটো বোন শেখ রেহানা ছিলেন। চট্টগ্রাম নগরীর পাশাপাশি ঢাকার শ্যামলী থেকে ধানমন্ডি ২৭-এ লাখো লোকের সমাগম দেখা গেছে। মোটরসাইকেলে হর্ন বাজিয়ে উল্লাস করতে দেখা গেছে। গণভবনে লুট চালিয়েছে জনসাধারণ। লেকের মাছ থেকে শয়নকক্ষের বালিশ, কোনোটাই বাদ পড়েনি। গণভবনের স্মৃতি হিসেবে তারা এসব জিনিস নিয়ে যাচ্ছে বলে গণমাধ্যমকে জানান।

[সূত্র: দৈনিক পূর্বদেশ, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

গেজেট থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে চট্টগ্রাম বিভাগের শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
২৭	১৫৪	রাকিব হোসেন	মোঃ আবুল খায়ের	দক্ষিণ নারায়নপুর মিয়াজী বাড়ী, ইছাপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর	দক্ষিণ নারায়নপুর মিয়াজী বাড়ী, ইছাপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
৩৩	৪৪৬	মোঃ ওয়াসিম	শফিউল আলম	দক্ষিণ মেহেনামা, পেকুয়া, কক্সবাজার	দক্ষিণ মেহেনামা, পেকুয়া, কক্সবাজার
৩৫	৫২৫	তানভির ছিদ্দিকী	বাদশা মিয়া	কালারমার চর, কক্সবাজার	কালারমার চর, কক্সবাজার
৩৭	৫৭৬	মোঃ নিজাম উদ্দীন	মোঃ সাহাব উদ্দিন	গনি হাকিমপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	গনি হাকিমপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

৩৮	৬১৩	মোঃ মজিদ হোসেন	মোঃ আমিন মিয়া	গ্রাম-রসুলপুর ওয়ার্ড নং-০৩, ইউনিয়ন-পাঠাছড়া, পো-নাকাপা, উপজেলা-রামগড়, জেলা-খাগড়াছড়ি	গ্রাম-রসুলপুর ওয়ার্ড নং-০৩, ইউনিয়ন-পাঠাছড়া, পো-নাকাপা, উপজেলা-রামগড়, জেলা-খাগড়াছড়ি
৪৩	১৫৯২	মোঃ জামাল	মোঃ সালেহ আহমেদ	কড়িয়ার দিঘীর পাড়, শামসু কোম্পানীর বাড়ী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	কুলগাও ছালেহ আহমেদর বাড়ি, খাজা রোড়, বায়েজিদ বোস্তামি, চট্টগ্রাম
৭২	৩৯৬৯	মাহামুদুর রহমান সৈকত	মাহবুবুর রহমান	এস-৩৮, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।	শেখ মারুফ গোমস্তার বাড়ী, গ্রামঃ মুসাপুর, ওয়ার্ড-১, আলী মিয়ার বাজার, পোস্ট অফিসঃ সন্দ্বীপ, উপজেলা-সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম।
৮৩	৪৬৩৮	মোঃ জিহাদ হাসান	মোঃ আলম মিয়া	৫৭/১৫৭/এ, পুর্বশেখদি, দনিয়া, শনির আখরা, ওয়ার্ড-৬২, ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন।	হাসানপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
৯৩	৭২৪৯	আলমগীর হোসেন	শাহাজাহান	৩০, চান্দাল্ভোগ, হরিরাম, উত্তরা, ঢাকা।	নূরা মিয়া সরদার বাড়ী, উত্তর কাজিরখিল, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
১০৪	৯৬৪৮	ওমর নুরুল আবছার	মোঃ নুরুল আবছার	পূর্ব বাসাবো, বাগান বাড়ি, সবুজবাগ, ঢাকা।	হাজী দেলোয়ার হোসেন সওদাগর এর বাড়ী, পোপাদিয়া ইউনিয়ন, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১০৯	১০২২০	শাব্বির হোসেন	আমির হোসেন	গ্রাম-শরীফপুর, পোষ্ট অফিস-ভবানীগঞ্জ, উপজেলা-লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা-লক্ষ্মীপুর	গ্রাম-শরীফপুর, পোষ্ট অফিস-ভবানীগঞ্জ, উপজেলা-লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা-লক্ষ্মীপুর
১২৭	১২১৯১	মোঃ রিফাত হোসেন	হানিফ মিয়া	সুকিপুর, দাশপাড়া, বারোপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা	সুকিপুর, দাশপাড়া, বারোপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
১৩০	১২৮২৭	মোঃ তুহিন আহমেদ	ছগির আহমেদ	হামিদ মেম্বার বাড়ি, সোনারামপুর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	হামিদ মেম্বার বাড়ি, সোনারামপুর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩৯	১৩৪১১	মোঃ আল আমীন	মোঃ বাবুল মিয়া	ঢাকা, নয়াবাড়ী, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	দৌলতপুর, লক্ষীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা
১৪০	১৩৪৩৬	মোঃ ফরিদ আহম্মদ ছৈয়াল	মোঃ শাহআলম ছৈয়াল	ছৈয়াল বাড়ি, ব্রাহ্মন সাখুয়া, ৮নং বাগাদি ইউনিয়ন বাঘড়া বাজার-৩৬০০, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	ছৈয়াল বাড়ি, ব্রাহ্মন সাখুয়া, ৮নং বাগাদি ইউনিয়ন বাঘড়া বাজার-৩৬০০, চাঁদপুর
১৫৫	১৩৮১৫	শাহ আলম	রেনু মিয়া	১৫২, নাছিরের টেক, ওয়ার্ড নং-২২ (পার্ট), হাতিরঝিল, ঢাকা	অনন্তপুর, জয়পুর, হোমনা, কুমিল্লা

১৬২	১৪০২২	মোঃ পারভেজ	মোঃ সোহরাব হোসাইন	কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	আমিন নগর, রামচন্দ্রপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা
১৬৩	১৪০৩৬	মোহাম্মদ ইসমামুল হক	নুরুল হক	দর্জিপাড়া, আমিরাবাদ, মাস্টারহাট-৪৩৯৬, লোহাগারা, চট্টগ্রাম	দর্জিপাড়া, আমিরাবাদ, মাস্টারহাট-৪৩৯৬, লোহাগারা, চট্টগ্রাম
১৬৪	১৪০৪৫	মোঃ আসিফ হোসেন	মোঃ মোরশেদ আলম	হাবিব উল্যার বাড়ী, মিরআলীপুর, মিরআলীপুর, মীরওয়ারিশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	হাবিব উল্যার বাড়ী, মিরআলীপুর, মিরআলীপুর, মীরওয়ারিশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
১৬৯	১৪১৪৯	মোঃ আল মামুন আমানত	মোঃ আব্দুল লতিফ	জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ	কৃষ্ণপুর বাজার, ধামঘর, মুরাদনগর, কুমিল্লা
১৭৩	১৪২০৮	ইমরান	সোযেব মিয়া	সাং-রামপুর, ৯নং ওয়ার্ড, ইউপি-৪নং গোয়াল নগর, থানা-নাসিরনগর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সাং-রামপুর, ৯নং ওয়ার্ড, ইউপি-৪নং গোয়াল নগর, থানা-নাসিরনগর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৭৮	১৪২৮৮	মোঃ ইমাম হাসান তায়িম ভূঁইয়া	মোঃ ময়নাল হোসেন ভূইয়া	রসুলপুর, দনিয়া, ওয়ার্ড নং-৬১ (পার্ট), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	এতবারপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, চান্দিনা, কুমিল্লা
১৮৮	১৪৪৯৮	মোহাম্মদ আব্দুর রহমান জিসান	বাবুল সর্দার	উত্তর পশ্চিমগাও, ওয়ার্ড নং-৫, কাজিপাড়া, লাকসাম, কুমিল্লা	উত্তর পশ্চিমগাও, ওয়ার্ড নং-৫, কাজিপাড়া, লাকসাম, কুমিল্লা
১৯০	১৪৫৩৫	মোঃ ইমন মিয়া	মোঃ সেলিম মিয়া	চৈনপুর, চৈনপুর, টনকী, মুরাদনগর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম	চৈনপুর, চৈনপুর, টনকী, মুরাদনগর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম
১৯১	১৪৫৪১	মোঃ সুলতান	মোঃ শহিদ উল্লাহ ব্যাপারী	শোলাকান্দি, জিয়ারকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা	শোলাকান্দি, জিয়ারকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা
১৯৪	১৪৬৫৩	মোঃ নাজমুল কাজী	মোঃ সেলিম কাজী	বংশাল, ঢাকা	দৌলতপুর, বাঙ্গারা-৩৫৪৩, মুরাদনগর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম
২০৮	১৭০৩৮	মোঃ মোবারক হোসাইন	রমজান আলী	গ্রাম-মোলাইশ, পশ্চিমপাড়া, উপজেলা-সরাইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	গ্রাম-মোলাইশ, পশ্চিমপাড়া, উপজেলা-সরাইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২১৩	১৭২৫১	মোঃ সাগর	মোঃ হানিফ মোল্লা	৩০৮, বড়শালঘর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	৩০৮, বড়শালঘর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
২১৪	১৭২৬১	মাহমুদুল হাসান	আব্দুস সাত্তার	সাং-মাস্টার বাড়ি, পাকশিমুল, ফতেপুর, অরুয়াইল, থানা-সরাইল জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সাং-মাস্টার বাড়ি, পাকশিমুল, ফতেপুর, অরুয়াইল, থানা-সরাইল জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২২৭	১৭৮৮৯	নাছিমা আক্তার	হাজী ইউসুফ আলী	ইউসুফ ভিলা মাইজদী নোয়াখালী কলেজ, নোয়াখালী পৌরসভা, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	ইউসুফ ভিলা মাইজদী নোয়াখালী কলেজ, নোয়াখালী পৌরসভা, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী

২৩৯	২০০৫৬	নাঈমা সুলতানা	গোলাম মোস্তফা	বাড়ি নং ১৫, রোড নং ৫, সেক্টর ৯, ঢাকা-১২৩০	গ্রাম-আমুয়াকান্দা, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
২৪০	২০০৮৬	মোঃ সামিউল আমান নূর	মোঃ আমান উল্লাহ	পূর্ব আরিচপুর, ভূইয়াপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর	তুলাতলী, সহদেবপুর তুলাই ফতেপুর, কচুয়া, চাঁদপুর
২৪৪	২০৩৪৯	জাহিদুজ্জামান তানভীন	মোঃ সামসুজ্জামান	৫৬, ১১ সেক্টর নং-১৩, ওয়ার্ড নং-৫১(পার্ট), উত্তরা পশ্চিম, ঢাকা	ভিটিবিশাড়া, রতনপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৪৬	২০৩৬৪	কাউছার হোসেন	ইসমাইল হোসেন	ইসমাইল পাটওয়ারী বাড়ি, উত্তর জয়পুর, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর	ইসমাইল পাটওয়ারী বাড়ি, উত্তর জয়পুর, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর
২৫৪	২০৭৮৪	আব্দুল রাকিব	মোঃ ইদ্রিস	যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	চাপিতলা, রামচন্দ্রপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা
২৬০	২০৯১৮	মোঃ পারবেজ মিয়া	মোঃ খোকন মিয়া	মাতুয়াইল পশ্চিম পাড়া, মাতুয়াইল, ওয়ার্ড নং-৬৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	তাহেরপুর, লামচর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
২৬১	২০৯২৬	সোহাগ মিয়া	মোহাম্মদ আলী	সূর্যপুর সাহারপাড়, ভানী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	সূর্যপুর সাহারপাড়, ভানী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
২৭০	২১২৭৪	মোঃ মনিরুল ইসলাম অপু	ফজল বেপারী	৭, গোলকপাল লেন, ঢাকা শহর, ওয়ার্ড নং-৩৫, কোতয়ালী, ঢাকা	রহমতপুর কলোনী, ১০ নং ওয়ার্ড, চাঁদপুর
২৮৫	২১৮৮২	রাযহান উদ্দিন	ফারুক উদ্দিন	গ্রাম: নয্যাগ্রাম, বিয্যানীবাজার পৌরসভা, উপজেলা: বিয্যানীবাজার, জেলা: সিলেট	গ্রাম: গাঙ্গোল হাটি, তালিকান্দি উপজেলা: সরাইল জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয্যা
৩০৪	২২২২৬	মোঃ ইউসুফ	শহীদ মিয়া	কোলতা বাজার, ঢাকা।	শতঘর, গোবুন্দ্রপুর লাকসাম, কুমিল্লা
৩০৯	২২২৪২	মোহাম্মদ আলম	মোহাম্মদ আব্দুছ ছোবহান	বার্মা কলোনী, ওয়ার্ড নং-০৭, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।	বার্মা কলোনী, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৩১০	২২২৪৬	ওয়াকিল আহাম্মদ (শিহাব)	পিতা: মো: সিরাজুল ইসলাম	গ্রাম:দক্ষিণ কাশিমপুর, পো: পাঁচগাছিয়া, ইউনিয়ন : পাঁচগাছিয়া, উপজেলা : ফেনী সদর, জেলা: ফেনী।	গ্রাম:দক্ষিণ কাশিমপুর, পো: পাঁচগাছিয়া, ইউনিয়ন : পাঁচগাছিয়া, উপজেলা : ফেনী সদর, জেলা: ফেনী।
৩১১	২২২৪৯	মো: ইকরাম হোসেন কাওছার	মো: আনোয়ার হোসেন	পাগলির কুল, শালধর বাজার, চিথলিয়া ইউনিয়ন, পরশুরাম, ফেনী।	পাগলির কুল, শালধর বাজার, চিথলিয়া ইউনিয়ন, পরশুরাম, ফেনী।
৩১৫	২২২৫৩	ইশতিয়াক আহমেদ	নেছার আহাম্মদ	গ্রাম-দক্ষিন আন্দপুর, পোঃহাসনাবাদ, থানা-ফুলগাজী, উপজেলা-ফুলগাজী, জেলা-ফেনী।	গ্রাম-দক্ষিন আন্দপুর, পোঃহাসনাবাদ, থানা-ফুলগাজী, উপজেলা-ফুলগাজী, জেলা-ফেনী

৩১৬	২২২৫৪	মোঃ সবুজ	আব্দুল মালেক	আব্দুল মালেকের বাড়ী, দক্ষিণ টুমচর-৫, চর গাজী, পোঃ রামগতির হাট, থানা -রামগতি, জেলা-লক্ষীপুর	আব্দুল মালেকের বাড়ী, দক্ষিণ টুমচর-৫, চর গাজী, পোঃ রামগতির হাট, থানা – রামগতি, জেলা-লক্ষীপুর
৩১৭	২২২৫৫	কাজী আশরাফ আহমেদ রিয়াজ	কাজী বাবুল	বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	বাগডা, বক্সগঞ্জ, নাঙ্গালকোট
৩২১	২২২৬৭	মোঃ মিলন	নুর ইসলাম	কান্নাপাড়া, নাঙ্গালকোট, কুমিল্লা	কান্নাপাড়া, নাঙ্গালকোট, কুমিল্লা
৩২৭	২২২৭৭	মাসুম মিয়া	মোঃ শাহীন মিয়া	উত্তর রামপুর, ২২ নং ওয়ার্ড, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	উত্তর রামপুর, ২২ নং ওয়ার্ড, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
৩৫২	২২৩৩১	জাকির হোসেন শাকিব	আবদুল লতিফ	গ্রাম : মান্দারী, মোল্লাবাড়ি, ২ নং বগাদানা ইউনিয়ন, উপজেলা-সোনাগাজী, জেলা-ফেনী	গ্রাম : মান্দারী, মোল্লাবাড়ি, ২ নং বগাদানা ইউনিয়ন, উপজেলা-সোনাগাজী, জেলা-ফেনী
৩৫৩	২২৩৩৩	মোঃ নিশান খান	মো হাফেজ খান	বিনোদ বাইদ, কামাল গার্মেন্টস রোড, সাভার, ঢাকা	গ্রাম: মনোহরখাদী, পোঃ মনোহরখাদী, ইউনিয়ন: বিষ্ণুপুর, উপজেলা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর।
৩৫৭	২২৩৪৪	আরিফ বেপারী	রজ্জব আলী বেপারী	গ্রামঃ টরকী, গজরা, মতলব উত্তর, উপজেলা, চাঁদপুর	গ্রামঃ টরকী, গজরা, মতলব উত্তর, উপজেলা, চাঁদপুর
৩৫৮	২২৩৪৬	খুবাইব আহমাদ	মাওলানা আব্দুর রহমান	গ্রাম-উজানী, পোঃ উজানী, কচুয়া, চাঁদপুর	গ্রাম-উজানী, পোঃ উজানী, কচুয়া, চাঁদপুর
৩৬৩	২২৩৫৭	আব্দুর রহমান গাজী	মোঃ আব্দুল মালেক গাজী	গ্রাম-মধ্য পিংড়া – গাজীবাড়ি, পোঃ মাস্টার বাজার, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর	গ্রাম-মধ্য পিংড়া – গাজীবাড়ি, পোঃ মাস্টার বাজার, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
৩৬৫	২২৩৬১	রাসেল বকাউল	নুরুল ইসলাম বকাউল	গ্রাম-পূর্ব রাজারগাও, বকাউল বাড়ি, পোঃ রাজারগাও, ওয়ার্ড নং ০৭, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর	গ্রাম-পূর্ব রাজারগাও, বকাউল বাড়ি, পোঃ রাজারগাও, ওয়ার্ড নং ০৭, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
৩৮০	২২৩৮০	দীন ইসলাম বেপারী	শাহআলম বেপারী	৮৮ নং, উত্তর যাত্রাবাড়ী, যাত্রাবাড়ী, ওয়ার্ড নং-৪৮, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	বেপারী বাড়ী মধ্য ঠেটালিয়া এনায়েতনগর, ফতেপুর (পূর্ব), মতলব উত্তর, চাঁদপুর
৩৮২	২২৩৮৯	মোঃ আবুল কালাম	সৈয়দুর রহমান	৫১২, বায়তুল ইবাত, মহিলা কলেজ রোড, উত্তর চর্থা, ওয়ার্ড নং-১১, কুমিল্লা আদর্শ সদর, কুমিল্লা	পূর্ব কাজির গাও, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম
৩৮৯	২২৪০২	আমির হোসেন	মোঃ খোরশেদ আলম	বড়গাঁও, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর	বড়গাঁও, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
৩৯২	২২৪১৩	আব্দুল কাদির	নুর মোহাম্মদ	গ্রাং-মানিকরাজ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।	গ্রাং-মানিকরাজ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

৩৯৪	২২৪২১	সাহাদাত হোসেন	খলিলুর রহমান	গ্রাং-বালিথুবা, বেপারী বাড়ি, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর	গ্রাং-বালিথুবা, বেপারী বাড়ি, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
৩৯৫	২২৪২৭	রাব্বি আলম	মোঃ বাবুল পাটওয়ারি	গ্রাম-নওগাঁ, ইউনিয়ন - উপাদি (উঃ), মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর	গ্রাম-নওগাঁ, ইউনিয়ন - উপাদি (উঃ), মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
৩৯৬	২২৪৩০	সৈকত চন্দ্র দে	দুলাল চন্দ্র দে	গ্রাম-বোয়ালিয়া, ইউনিয়ন -উপাদি (উঃ), মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর	গ্রাম-বোয়ালিয়া, ইউনিয়ন -উপাদি (উঃ), মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
৩৯৯	২২৪৩৫	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ খলিল রহমান	গ্রাম-পিংড়া, ইউনিয়ন -উপাদি (দঃ), মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর	গ্রাম-পিংড়া, ইউনিয়ন -উপাদি (দঃ), মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
৪০২	২২৪৪০	মোঃ মাযহারুল ইসলাম	আব্দুল খালেক মিব্বী	আব্দুল খালেক মিব্বী বাড়ি পাটারির হাট, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম	আব্দুল খালেক মিব্বী বাড়ি পাটারির হাট, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম
৪০৩	২২৪৪১	মোঃ আবুল হোসেন মিজি	দেলোয়ার হোসেন মিজি	গ্রাম-কমলাপুর (মিঠু খান বাড়ী) বালিয়া, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	গ্রাম-কমলাপুর (মিঠু খান বাড়ী) বালিয়া, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর
৪০৪	২২৪৪৬	জহিরুল ইসলাম	শাহ আলম সরকার	মহেশপুর, ইউসুফপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	মহেশপুর, ইউসুফপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৪০৫	২২৪৪৭	আব্দুর রহমান	হাছান দেওয়ান	গ্রাম-বালিয়া দেওয়ান বাড়ী, বালিয়া, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।	গ্রাম-বালিয়া দেওয়ান বাড়ী, বালিয়া, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
৪০৬	২২৪৪৯	জাবির ইব্রাহীম	কবির হোসেন	তুলাই শিমুল, মনিয়ন্দ, উপজেলা: আখাউড়া, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া	তুলাই শিমুল, মনিয়ন্দ, উপজেলা: আখাউড়া, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪০৯	২২৪৫৩	মোঃ সুজন খান	মঞ্জিল খান	হাশেমপুর, খান বাড়ি, মতলব উত্তর, চাঁদপুর	হাশেমপুর, খান বাড়ি, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
৪১১	২২৪৫৫	জসিম	জরুন মিয়া	সাং-বারপাইকা, ইউপি-অরুয়াইল, থানা-সরাইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সাং-বারপাইকা, ইউপি-অরুয়াইল, থানা-সরাইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪১২	২২৪৫৬	মোঃ আবদুর গনি	মো: আহছান উল্ল্যাহ	বর্তমান কর্মস্থল : সন্ধানী লাইফ টাওয়ার, রাজউক প্লট নং-৩৪, বাংলা মটর, হেড অফিস, ঢাকা-১০০০	গ্রাম : ছাড়াইতকান্দি, পোঃ ভৈরবচৌধুরীবাজার ৩৯৩১, ওয়ার্ডনং-৩, আরভ আলী মেস্তরীর বাড়ি, সোনাগাজী, ফেনী
৪১৩	২২৪৫৭	মোঃ সরোয়ার জাহান মাসুদ	মোঃ শাহ জাহান টিপু	মীর বাড়ী, সিলোনিয়া, উত্তর জায়লস্কর, দাগনভূঁঞা, ফেনী	মীর বাড়ী, সিলোনিয়া, উত্তর জায়লস্কর, দাগনভূঁঞা, ফেনী
৪১৫	২২৪৫৯	তানজিল মাহমুদ সুজয়	মো: শফিকুল ইসলাম	৬নং ওয়ার্ড, বিটঘর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬নং ওয়ার্ড, বিটঘর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪১৭	২২৪৬১	মোঃ সোহেল	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	গ্রাম-মুক্তিরকান্দি পোঃ পাঠান বাজার, ওয়ার্ড নং-০৭, মতলব উত্তর, চাঁদপুর	গ্রাম-মুক্তিরকান্দি পোঃ পাঠান বাজার, ওয়ার্ড নং-০৭, মতলব উত্তর, চাঁদপুর

৪১৯	২২৪৬৪	মোঃ ইসমাইল	মোঃ ইব্রাহিম মিয়া	উঃ পাড়া, নতুন হাটি, বাঞ্ছারামপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	উঃ পাড়া, নতুন হাটি, বাঞ্ছারামপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪২২	২২৪৬৯	মোঃ ফারুক	দুলাল	কালা মিয়ার বাড়ী, হাই লেবেল রোড, লালখান বাজার, ওয়ার্ড নং-১৪, খুলশী, চট্টগ্রাম।	মোল্লা বাড়ি, শরিফ পুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম।
৪২৩	২২৪৭০	মোঃ বাবু	মোঃ মান্নান	তুজারভাঙ্গা, ওজারভাঙ্গা, ওয়ার্ড নং-০৪, দাউদকান্দি, কুমিল্লা ।	তুজারভাঙ্গা, ওজারভাঙ্গা, ওয়ার্ড নং-০৪, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
৪২৫	২২৪৭২	শহীদুল ইসলাম	মোঃ রফিকুল ইসলাম	রিপনের বাড়ি, রসুলবাগ আ/এ এ ব্লক রোড, রসুলবাগ আ/এ, ওয়ার্ড নং-১৭, বাকলীয়া, চট্টগ্রাম	ড্রাইভার বাচ্চু মিয়ার বাড়ি, খাল পাড় রোড, খালপাড়, , চাঁদগাও, চট্টগ্রাম
৪২৬	২২৪৭৩	মোঃ ইমরান	মোঃ আলম মিয়া	যাত্রাবাড়ি, দনিয়া রসুলপুর	চরলহনিয়া দক্ষিনপাড়া, ফরদাবাদ, বাঞ্ছারামপুর , ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪৩৩	২২৪৮৪	মো: হোসাইন	মো: মানিক মিয়া	সাং-বরিশল পশ্চিমপাড়া, বাসুদেব ইউনিয়ন, থানা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সাং-বরিশল পশ্চিমপাড়া, বাসুদেব ইউনিয়ন, থানা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪৩৬	২২৪৮৭	মোঃ রবিন মিয়া	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	ওয়াহেদপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	ওয়াহেদপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৪৩৯	২২৪৯০	জোবায়ের ওমর খাঁন	এড: জাহাঙ্গীর আহমেদ খাঁন	বাড়ি নং ২৮০, ব্লক ডি, নয়াপাড়া, ভান্ডারীপুল দক্ষিণ কদমতলী, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	সাং-সৈয়দাবাদ (দক্ষিণপাড়া), ২নং ওয়ার্ড, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪৪৬	২২৫০১	হাছান হোসেন	মোঃ কবির হোসেন	সিকদার বাড়ি, কড়ইয়া, কচুয়া, চাঁদপুর	সিকদার বাড়ি, কড়ইয়া, কচুয়া, চাঁদপুর
৪৪৭	২২৫০২	রফিকুল ইসলাম	মৃত মোহাম্মদ মমিন	সাং-দয়ালনগর, নতুন থোল্লাকান্দি গ্রাম, বড়িকান্দি ইউনিয়ন, উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সাং-দয়ালনগর, নতুন থোল্লাকান্দি গ্রাম, বড়িকান্দি ইউনিয়ন, উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪৫১	২২৫০৭	কামরুল মিয়া	নান্নু মিয়া	রায়হান, বাড়ী-৩, ব্লক-এ, সেকশন-৬ লেন-৫, মিরপুর, ঢাকা।	একশত নব্বই, গৌরনগর কৃষ্ণ নগর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৪৫৫	২২৫১১	আলা উদ্দিন	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	গ্রাম-শেখ নগর, পোঃ ভেদুরিয়া বাজার, ফরাজীকান্দি, মতলব উত্তর, চাঁদপুর	গ্রাম-শেখ নগর, পোঃ ভেদুরিয়া বাজার, ফরাজীকান্দি, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
৪৫৯	২২৫১৬	রায়হান রাব্বী	ফজর আলী	খায়রাবাদ, জাফরগঞ্জ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	খায়রাবাদ, জাফরগঞ্জ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৪৬৮	২২৫২৭	আমিনুল ইসলাম সাব্বির	আলমগীর হোসেন	দক্ষিণ ভিংলাবাড়ি, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	দক্ষিণ ভিংলাবাড়ি, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৪৭৮	২২৫৪১	আওয়াল মিয়া	মৃত মোহর আলী	মোছাগাড়া, যাত্রাপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা	মোছাগাড়া, যাত্রাপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা

৪৮০	২২৫৪৩	ইউনুছ আলী শাওন	আবুল বাশার	মিন্না আলী হাজী বাড়ী, গ্রাম-ধন্যপুর, ওয়ার্ড-৮, বড়ালিয়া, সদর, লক্ষ্মীপুর।	গ্রাম-দক্ষিণ মাগুরী, হামিদ কাজী বাড়ী, ওয়ার্ড-৯, উত্তর জয়পুর, পো: দত্তপাড়া, সদর, লক্ষ্মীপুর।
৫২০	২২৫৯৭	জামশেদুর রহমান	শাহজালাল	ফেলনা, মুন্সিরহাট, চৌদ্দপগ্রাম, কুমিল্লা	ফেলনা, মুন্সিরহাট, চৌদ্দপগ্রাম, কুমিল্লা
৫২১	২২৫৯৮	মোঃ সাইফুল ইসলাম তন্ময়	মোঃ শফিকুল ইসলাম রানা	জহির বাড়ী, এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	জহির বাড়ী, এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৫২৩	২২৬০২	শামছুল ইসলাম	হাবিব উল্লা	সি-২৯, শান্তিনগর বাজার রোড, সি-২৯, শান্তিনগর বাজার রোড, শান্তিনগর বাজার রোড, ওয়ার্ড নং-১৩, পল্টন, ঢাকা।	শ্রীরামপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।
৫২৫	২২৬০৫	মোহাম্মদ হাসান	মোঃ মামুন উদ্দিন	আমিন উদ্দিনের নতুন বাড়ী, পূর্বপাড়া, কাঁশারপাড়, ওয়ার্ড নং-৬, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী	আমিন উদ্দিনের নতুন বাড়ী, পূর্বপাড়া, কাঁশারপাড়, ওয়ার্ড নং-৬, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
৫২৯	২২৬১০	মোঃ ইমান গাজী	হাজিল গাজী	সাং-পূর্ব বাখরপুর ০৩ নং ওয়ার্ড, চান্দ্রা ইউনিয়ন, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।	সাং-পূর্ব বাখরপুর ০৩ নং ওয়ার্ড, চান্দ্রা ইউনিয়ন, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
৫৩৮	২২৬২১	মোঃ মনির হোসেন	মোঃ মমতাজুর রহমান	আমিনবাড়ি, তালতলা, দাদঘর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	আমিনবাড়ি, তালতলা, দাদঘর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা
৫৪০	২২৬২৩	মোঃ শামীম	আবদুল হাই	মুরাদ বাড়ি, সবুজ গ্রাম, সবুজ গ্রাম, আসল পাড়া চর আলেকজান্ডার, রামগতী, লক্ষ্মীপুর	মুরাদ বাড়ি, সবুজ গ্রাম, সবুজ গ্রাম, আসল পাড়া চর আলেকজান্ডার, রামগতী, লক্ষ্মীপুর
৫৪৭	২২৬৩১	মোঃ ফয়সাল সরকার	সফিকুল ইসলাম সরকার	নাজির মন্দের বাড়ি, এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	নাজির মন্দের বাড়ি, এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৫৫৪	২২৬৩৮	আহসান হাবিব তামিম	মোঃ আব্দুল মান্নান	১৫৯/১, সেনপাড়া, ওয়ার্ড নং-১৪(পার্ট), কাফরুল, ঢাকা	আমজাদা মুন্সি বাড়ি, পূর্ব শোশালিয়া, পরকোট, চাটখিল, নোয়াখালী
৫৫৫	২২৬৩৯	মোহাম্মদ রায়হান	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন	পূর্ব দুর্গানগর, নোয়ান্নই ইউনিয়ন, ১ নং ওয়ার্ড, নোয়াখালী	পূর্ব দুর্গানগর, নোয়ান্নই ইউনিয়ন, ১ নং ওয়ার্ড, নোয়াখালী
৫৬৫	২২৬৫০	হাফেজ মাসুদুর রহমান মানিক	ওলীউল্লাহ	অর্জুনতলা ৮ নং ওয়ার্ড, বরুড়া পৌরসভা, বরুড়া, কুমিল্লা	অর্জুনতলা ৮ নং ওয়ার্ড, বরুড়া পৌরসভা, বরুড়া, কুমিল্লা
৫৮০	২২৬৭৭	মোঃ রুবেল মিয়া	মোঃ রফিকুল ইসলাম (মৃত)	বাড়েরা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	বাড়েরা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
৬১৬	২২৭৩১	পারভেজ হোসেন	নবী উল্যাহ	মিন্না আলী হাজী বাড়ী-ধন্যপুর, ওয়ার্ড-০৮, বড়িতোলা, সদর, লক্ষীপুর	মিন্না আলী হাজী বাড়ী-ধন্যপুর, ওয়ার্ড-০৮, বড়িতোলা (চন্দ্রগঞ্জ), সদর, লক্ষীপুর
৬২১	২২৭৩৮	সাদ আল আফনান	সালেহ আহম্মেদ	বাঞ্চানগর, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, লক্ষ্মীপুর-৩৭০০, লক্ষীপুর।	গ্রাম-খিদিরপুর, ওয়ার্ড-০১, উপজেলা-সদর, লক্ষ্মীপুর।
৬২৩	২২৭৪১	হামিদুর রহমান সাদমান	ইকবাল মজুমদার	দীঘলগাও, চৌয়ারা, সদর দক্ষিন, কুমিল্লা	দীঘলগাও, চৌয়ারা, সদর দক্ষিন, কুমিল্লা

৬২৯	২২৭৪৮	মোঃ মাহিন	মৃত আমিন রসুল	গ্রাম-হারামিয়া, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর-বক্তারহাট, সন্দীপ, চট্টগ্রাম	গ্রাম-হারামিয়া, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর-বক্তারহাট, সন্দীপ, চট্টগ্রাম
৬৩১	২২৭৫১	মোঃ সিয়াম সর্দার ওরফে জিহাদ	সোহাগ সর্দার	গ্রাং-দক্ষিণ হামানকর্দি, সর্দার বাড়ী, মৈশাদী, চাঁদপুর সদর, , চাঁদপুর।	গ্রাং-দক্ষিণ হামানকর্দি, সর্দার বাড়ী, মৈশাদী, চাঁদপুর সদর, , চাঁদপুর।
৬৩৬	২২৭৫৯	শাহাদাত হোসেন শাওন	মোঃ বাছির আলম	দিঘলী বাড়ি খাজুরিয়া খাজুরিয়া মাদ্রাসা ৩৮৬৪, ওয়ার্ড-৩, কেশারপাড়, সেনবাগ, নোয়াখালী	দিঘলী বাড়ি খাজুরিয়া খাজুরিয়া মাদ্রাসা ৩৮৬৪, ওয়ার্ড-৩, কেশারপাড়, সেনবাগ, নোয়াখালী
৬৩৮	২২৭৬১	মোঃ মাহবুবুল হাসান	মোঃ নোমান হোসেন	তরপ পাটোয়ারী বাড়ী, চর চান্দিয়া, সোনাগাজী, ফেনী	তরপ পাটোয়ারী বাড়ী, চর চান্দিয়া, সোনাগাজী, ফেনী
৬৪২	২২৭৬৯	শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত	আবদুল মজিদ	কাজী বাড়ী, ইলাসপুর, উজিরপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	কাজী বাড়ী, ইলাসপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
৬৪৫	২২৭৭২	মোঃ মাহমুদুল হাসান রিজভী	মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন	দিপু মঞ্জিল, রাজারামপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	তফাজ্জল হুজুরের বাড়ি, গ্রামঃচরকৈলাশ (পৌরসভা ১নং ওয়ার্ড), ডাকঘর-হাতিয়া, থানা-হাতিয়া, জেলা-নোয়াখালী।
৬৪৭	২২৭৭৪	ফয়েজ	আলা উদ্দিন বেপারী	বেপারী বাড়ী, উত্তর চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	বেপারী বাড়ী, উত্তর চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর
৬৫২	২২৭৭৯	আহসান হাবিব	হেলাল উদ্দিন	আসত আলী পাড়া, ৯ নং ওয়ার্ড, হাসের দীঘি, ফাসিয়াখালী ইউনিয়ন, চকরিয়া, কক্সবাজার।	আসত আলী পাড়া, ৯ নং ওয়ার্ড, হাসের দীঘি, ফাসিয়াখালী ইউনিয়ন, চকরিয়া, কক্সবাজার।
৬৫৭	২২৭৮৪	সৈয়দ মুনতাসির রহমান আলিফ	সৈয়দ গাজিউর রহমান	ঢাকার ঠিকানা-৫৮, দক্ষিণ কুতুবখালি, (রসুলপুর), দুনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	গ্রাম, দেওভান্ডার, ডাকঘর - দৌলখাড়, উপজেলা-নাঙ্গলকোট, জেলা -কুমিল্লা।
৬৬০	২২৭৮৮	সৈয়দ মোঃ মোস্তফা কামাল (রাজু)	সৈয়দ আব্দুল করিম	পশ্চিম বিঘা(সৈয়দ বাড়ী), পশ্চিম বিঘা, কাঞ্চনপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর	পশ্চিম বিঘা(সৈয়দ বাড়ী), পশ্চিম বিঘা, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
৬৬৫	২২৭৯৭	হান্নান	আমিন মিয়া	গ্রাম-মৈশামুড়া, (বড় বাড়ী), ওয়ার্ড নং-০২, গন্ধর্ব্যপুর উত্তর, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।	গ্রাম-মৈশামুড়া, (বড় বাড়ী), ওয়ার্ড নং-০২, গন্ধর্ব্যপুর উত্তর, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
৬৭২	২২৮০৫	আজাদ সরকার	আনু মিয়া সরকার	টোরাগড়, ৮ নং ওয়ার্ড, হাজীগঞ্জ পৌরসভা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।	টোরাগড়, ৮ নং ওয়ার্ড, হাজীগঞ্জ পৌরসভা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
৬৭৩	২২৮০৬	মোঃ পারভেজ বেপারী	মোঃ সবুজ	গ্রাম-বারহাতিয়া, পোঃ এনায়েত নগর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর	গ্রাম-বারহাতিয়া, পোঃ এনায়েত নগর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
৬৭৯	২৩০১০	শাহিনুর বেগম	আঃ হাকিম	ভূইয়া বাড়ী, সাপমারা, লক্ষনখোলা, রাধানগর, মেঘনা, কুমিল্লা	ভূইয়া বাড়ী, সাপমারা, লক্ষনখোলা, মেঘনা, কুমিল্লা

৬৮২	২৩৪৯০	ছাইদুল ইসলাম	মোঃ রফিকুল ইসলাম	লকিয়ত উল্যাহ সওদাগর বাড়ী, উত্তর ফাজিলপুর, কলাতলী, ফেনী সদর, ফেনী	লকিয়ত উল্যাহ সওদাগর বাড়ী, উত্তর ফাজিলপুর, কলাতলী, ফেনী সদর, ফেনী
৬৯৬	২৪৩১০	মোঃ জাহিদ হোসেন	মোঃ জাহাংগীর আলম	হাউস-৫০৯, ডব্লিউ-নাখাল পাড়া, ঢাকা।	গ্রাম-ইসলামপুর, ডাকঘর-শিবপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৬৯৮	২৪৩৩৮	ফয়জুল ইসলাম রাজন	নুরে আলম	৫৫/২/১, পূর্ব বাইশাটেকী মিরপুর-১৩, সেনপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৪, কাফরুল, ঢাকা	পাচানি শিকদার বাড়ি, পাচানি, নারায়নপুর, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর,
৭০৩	২৪৫২৬	মোঃ আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী	মোঃ আল-আমীন পাটোয়ারী	০১, কবরস্থান পূর্ব এলাকা-১, শেহলাবুনিয়া, ওয়ার্ড নং-০৩, মোংলা, বাগেরহাট	উদন পাড়া, সাউধের খিল, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
৭০৪	২৪৫২৭	মোঃ মামুন হোসেন	আব্দুল মতিন	হাবিব উল্যাহ বেপারী বাড়ি, জালিয়াল, ৫নং বিনোদপুর নোয়াখালী	হাবিব উল্যাহ বেপারী বাড়ি, জালিয়াল, ৫নং বিনোদপুর নোয়াখালী
৭০৬	২৪৫২৯	মোঃ রিটন উদ্দিন	মোঃ আবুল কালাম	নুর আঃ ডাক্তার বাড়ি, লামচরী, , নলচিরা, হাতিয়া, নোয়াখালী	নুর আঃ ডাক্তার বাড়ি, লামচরী, , নলচিরা, হাতিয়া, নোয়াখালী
৭১৬	২৪৫৪৩	সাইফুল ইসলাম আরিফ	আলতাপ হোসেন	৫৯২, কৌশল্যা, কৌশল্যা, সিন্দুরপুর, দাগনভূঁঞা, ফেনী	৫৯২, কৌশল্যা, কৌশল্যা, সিন্দুরপুর, দাগনভূঁঞা, ফেনী
৭২৪	২৪৫৭৪	মোঃ ইউছুফ	মোঃ ইউনুছ	ঘোরা পট্টি, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, ফিরিংঙ্গি বাজার, ওয়ার্ড নং-৩৩, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম	মুনচুর চৌঃ বাড়ী তেলী পাড়া, পশ্চিম দলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৭২৭	২৪৫৯৯	মোহাম্মদ সাজিদুর রহমান ওমর	MD SHAHAJAHAN	তাজমহল রোড, প্যারাদোগার নুতুন পাড়া, প্যারাদোগার-১৩৬২, ডেমরা, ঢাকা	পাট্টান, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭৩৯	২৪৬৪২	মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক	মোঃ আবুল হাসেম	ওচিমিয়ার বাড়ী, ইয়াকুবপুর, দাগনভূঁঞা, ফেনী	হাসেম মিয়ার বাড়ী, সিরাজপুর, মোহাম্মদ নগর, মোহাম্মদ নগর, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী
৭৪৭	২৪৭৬২	ওবায়দুল ইসলাম	ওমর আলী	৪৭ রোড-৩, গোবিন্দপুর, দনিয়া, ওয়ার্ড নং-৬২ (পার্ট), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ।	চালি ভাংগা, জানানেয় , শিবনগর, মেঘনা, কুমিল্লা
৭৫১	২৪৮১৯	আব্দুল জব্বার	আব্দুল মতিন	৩৭২/৩, ১২নং গলি, পশ্চিম নাখাল পাড়া, ওয়ার্ড নং-২৫(পার্ট), তেজগাঁও, ঢাকা	মহব্বতপুর, সোনাপুর, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী
৭৬৩	২৪৯৮৪	মোঃ তাজুল ইসলাম	মোঃ আইয়ব আলী	বাইমাকান্দা, নাগরী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর	মিঝি বাড়ী, গামারুয়া, গামারুয়া, বরুড়া, কুমিল্লা
৭৬৭	২৫০৮৫	নুরুল আমিন	ছৈয়দ নূর	জেলাঃ কক্সবাজার, উপজেলাঃ ঈদগাহ, ইউনিয়নঃ ইসলামাবাদ, ওয়ার্ড নং ০৯, পাড়াঃ-পূর্ব গজালিয়া ঢালার মুখ।	জেলাঃ কক্সবাজার, উপজেলাঃ ঈদগাহ, ইউনিয়নঃ ইসলামাবাদ, ওয়ার্ড নং ০৯, পাড়াঃ-পূর্ব গজালিয়া ঢালার মুখ।

৭৬৮	২৫১৬২	মোঃ কাওছার মাহমুদ	মোঃ আবদুল মোতালেব	আহাম্মদ উল্যা মাষ্টার বাড়ী নলচড়া, ইউনিয়ন-ভাট্রা, থানা-রামগঞ্জ, জেলা-লক্ষ্মীপুর।	আহাম্মদ উল্যা মাষ্টার বাড়ী নলচড়া, ইউনিয়ন-ভাট্রা, থানা-রামগঞ্জ, জেলা-লক্ষ্মীপুর।
৭৭২	২৫১৯১	মোঃ জুয়েল	মোঃ সিরাজ	সেলিমের বাটী, ভাদাইল, গনকবাড়ী, ধামসোনা, সাভার, ঢাকা	জিয়ার কান্দি, জিয়ার কান্দি, জিয়ারকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা
৭৮৪	২৫৮৮৫	মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন	মোঃ হাবিবুর রহমান	ওয়ারী মিয়া ব্যাপারী বাড়ী, গোবিন্দপুর, হাট পুকুরিয়া ঘাটলা বাগ, চাটখিল, নোয়াখালী	ওয়ারী মিয়া ব্যাপারী বাড়ী, গোবিন্দপুর, হাট পুকুরিয়া ঘাটলা বাগ, চাটখিল, নোয়াখালী
৭৮৮	২৫৯৩৬	সৈয়দ নাজমুল হাসান	মোঃ সৈয়দ আবুল কায়েস	৪০, আফতাবনগর, ব্লক বি রোড-০২, বাড্ডা, ওয়ার্ড নং-৩৭, বাড্ডা, ঢাকা	বাইড়া, বাইড়া, চাপিতলা, মুরাদনগর, কুমিল্লা
৭৯১	২৬১৫৫	মো: রোহান আহম্মেদ খান	মোঃ সুলতান আহমেদ খান	বর্তমান ঠিকানা: ১৩৬৪/২ দক্ষিণ দনিয়া, বাইতুস সালাম জামে মসজিদ রোড, কদমতলী, ঢাকা।	স্থায়ী ঠিকানা: ৯ নং বালিয়া, ৩ নং ওয়ার্ড, জেলা-চাঁদপুর, থানা-চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর
৮০৫	২৮১২৭	মোঃ বেলাল হোসেন	কবির হোসেন	আঃ রব মিয়ার বাড়ী, হাজীপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	আঃ রব মিয়ার বাড়ী, হাজীপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
৮১১	৩০২০৬	মোহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসেন	মোঃ জসিম রাজা	রাজাবাড়ী, উত্তর রঘুনাথপুর, চাঁদপুর-৩৬০১, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	রাজাবাড়ী, উত্তর রঘুনাথপুর, চাঁদপুর-৩৬০১, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর
৮২০	৩৩৩৩৩	মোঃ হৃদয়	মোঃ মুকুল	বাসা/হোল্ডিং: কাজলা নতুন রাস্তা, গ্রাম/রাস্তা: কাজলা নতুন রাস্তা, মৌজা/ মহল্লা: যাত্রাবাড়ী, ইউনিয়ন ওয়ার্ড: ওয়ার্ড নং-৪৮, ডাকঘর: গেন্ডারিয়া টি এস ও - ১২০৪, উপজেলা: যাত্রাবাড়ী, জেলা: ঢাকা,	বাসা/হোল্ডিং: গ্রাম/রাস্তা: পালের বাজার, মৌজা/মহল্লা: পালের বাজার, ইউনিয়ন ওয়ার্ড: উত্তর দাউদকান্দি, ডাকঘর: রাফের দিয়া, উপজেলা: দাউদকান্দি, জেলা: কুমিল্লা
৮২২	৩৩৬০৪	আশিকুর রহমান	কামাল মিয়া	গকুলনগর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	গকুলনগর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

দিন পেরিয়ে রাতেও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার পতনের পর দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এরপরও কোটা আন্দোলন ঘিরে কয়েকদিনের সহিংসতায় সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। ৫ই আগস্ট সোমবার দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ফাঁড়িতে আগুনের ঘটনায় পুলিশের মধ্যে ছিল সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক।

সরকার পতনের খবর প্রচার হওয়ার পর থেকে সারাদেশে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে সাধারণ জনগণ। তবে ৬ই আগস্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশ পুলিশ কর্মবিরতির ঘোষণা দিলে চট্টগ্রাম নগরী এক রকমের নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের বেশির ভাগ রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি ছিল না। তবে সকাল ১১টার পর থেকে ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে নগরের ২নং গেট মোড়। যানজট নিরসনে কাজ শুরু করেন তারা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাসেল উদ্দীন *নিউজনাউকে* বলেন, আমি সকাল ১১টার দিকে বের হয়ে দেখি পুরো ২নং গেটে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে যানবাহন। পরে আমি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনি। এর পরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এগিয়ে আসলে নগরের অন্যান্য মোড়েও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শাহরিয়ার মাহমুদ বলেন, আমাদের আজকে নগর ক্লিনিং-এর কর্মসূচি ছিল। পরে ট্রাফিকের অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা দেখে আমি ও আমার বন্ধুরা ওয়াসা মোড়ের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করি।

শিক্ষার্থীদের সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। পথচারীদের অনেকে শিক্ষার্থীদের সাথে ছবি তুলছেন, বাহবা দিচ্ছেন। অনেকে গাড়ি থেকে হাত বের করে এগিয়ে দিচ্ছে পানির বোতলসহ শুকনো খাবার। তাদের মতো একজন নাসিরাবাদের বাসিন্দা ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, ছাত্রদের প্রতি আমাদের ভরসা আছে। তাদের এই উদ্যোগের ফলে নগরীর যান চলাচল স্বাভাবিক হচ্ছে।

বাস চালক জসিম আহমেদ জানান, এই জায়গাগুলো (২নং গেট মোড়) অনেক রিস্ক। এখানে নিয়ন্ত্রণ ছাড়া গাড়ি চলাচল করলে জ্যাম হয়। আমাদের ছাত্ররা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে বলে আমরা সুন্দরভাবে গাড়ি চালাতে পারছি।

দিন শেষে ল্যাম্পপোস্টের আলোতেও নগরের মোড়ে মোড়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ট্রাফিক ব্যবস্থা। রাত ৮টার দিকে নগরের চকবাজার মোড়ে লাঠি হাতে সড়কে দাঁড়িয়ে ছিল ছাত্রীরা। তারা নির্দেশনা দিচ্ছেন যানজট নিরসনে। সিগন্যাল ছাড়ছে, আর গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে গন্তব্যে। দেশে যতদিন না শান্তি আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে ততদিন রাজপথে থাকবে বলে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা।

[সূত্র: নিউজনাউ২৪.কম, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রথম শহিদ ওয়াসিম আকরাম

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রথম শহিদ ওয়াসিম আকরাম। ১৬ই জুলাই বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রামের মুরাদপুর এলাকায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের দ্বিমুখী সংঘর্ষে ওয়াসিম শহিদ হন।

চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান অনুষদে স্নাতক তৃতীয়বর্ষে অধ্যয়নরত ওয়াসিম চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি চকবাজার এলাকার একটি মেসে থাকতেন।

ওয়াসিমের সহপাঠী ইমরান হোসেন ও তৌহিদুল ইসলামের সাথে আলাপকালে প্রতিবেদককে তারা বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন ওয়াসিম। তিনি নগরীর প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। আন্দোলন ধীরে ধীরে সহিংস হয়ে উঠলেও দমে যাননি স্বৈরাচারবিরোধী অকুতোভয় এ বীর সেনানী। বরং অন্য সহযোদ্ধাদের মতোই আরো বেশি সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মধ্য জুলাইয়ে পরিস্থিতি মারমুখী হয়ে ওঠে। আমরা জানতে পারি, ১৬ই জুলাই দুপুর থেকে নগরীর বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান নেয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা। দুই নম্বর গেট এলাকায় একটি বাস ভাঙচুর করে তারা। বিকেল ৩টা থেকে নগরীর মুরাদপুর, ২নং গেট ও ষোলশহরের আশপাশের এলাকায় কোটা আন্দোলনকারীদের সাথে ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের শুরুতে লাঠিপেটা করা হলেও, পরে গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। এসময় পুলিশের সাথে সাদা পোশাকের কয়েকজন অস্ত্রধারীকে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। বেশ কিছু ককটেলও বিস্ফোরিত হয়।

আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি শুরু করে। পরে তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে অনেক্ষণ চলতে থাকে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের অনেকে অলিগলিতে ঢুকে পড়লে সেখানেও খুঁজে বের করে হামলা করা হয়।

তার সহপাঠীরা বলেন, মৃত্যুর আগের দিন ওয়াসিম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্ট দেয়। পোস্টটিতে সে লিখেছিল, 'সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে আছে আমার প্রাণের সংগঠন। আমি এই পরিচয়েই শহিদ হবো।'এর ঠিক ১৬ ঘণ্টা পরই শহিদ হলেন ওয়াসিম আকরাম। চট্টগ্রামের প্রথম শহিদ। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মী। কক্সবাজার জেলার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ মেহেরনামা বাজার এলাকার প্রবাসী শফিউল আলমের মেজো ছেলে।

ওয়াসিমের বাবা প্রবাসী, মধ্যপ্রাচ্যের কাতারে একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। পিতামাতার ৫ সন্তানের মাঝে ওয়াসিম দ্বিতীয়। সবাই গ্রামের বাড়িতে থাকেন। বড়ো ভাই মহিউদ্দিন চাকরি করেন। ছোটো আরও এক ভাই ও দুই বোন পড়াশোনা করে।

মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে পরিবারের পক্ষে কথা বলেন ওয়াসিমের চাচা মাওলানা জয়নাল আবেদীন। আবেগাপ্লুত চাচা জয়নাল জানান, ওয়াসিম কোটা সংস্কার আন্দোলনে গিয়ে এভাবে হারিয়ে যাবে কেউ কল্পনাও করেনি। তাকে হারিয়ে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে আমাদের পরিবারের ওপর। তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল আমাদের। সে স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায় ১৬ই জুলাই বিকেলের একটি বুলেটে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে চাচা মাওলানা জয়নাল জানান, আমার ইমামতিতে ১৭ই জুলাই ওয়াসিমের জানাজা হয় এবং পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এলাকাবাসী জানায়, ওয়াসিমের মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। চট্টগ্রাম শহরে পড়াশোনার ফাঁকে গ্রামে যেতেন ওয়াসিম। বিনয়ী হওয়ার কারণে সবাই তাকে পছন্দ করতেন। তিনিও সবার সাথে আন্তরিকভাবে মিশতেন। ওয়াসিমের পরিবারকে সরকার সর্বোতভাবে সাহায্য করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন স্থানীয়রা। ওয়াসিমের মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবি জানান পরিবার সদস্যরা।

[সূত্র: বাসস, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২৪]

দেশের দুটি জলাভূমিকে 'জলাভূমিনির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা

রাজশাহী জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিকে 'জলাভূমিনির্ভর প্রাণী অভয়ারণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। ৭ই মে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বন শাখা-২ থেকে জারি করা পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণাকৃত অভয়ারণ্য দুটি হলো রাজশাহীর তানোর উপজেলার বিলজোয়ানা মৌজার ১.৬৫ একর জলাভূমি এবং গোদাগাড়ি উপজেলার বিলভালা মৌজার ১৫.০৮ একর জলাভূমি।

বিলজোয়ানা ও বিলভালা শীতকালে দেশি ও পরিযায়ী পাখির অন্যতম আশ্রয়স্থল। এসব বিলে কালেম, কোড়া, ডাহুক, গুড়গুড়ি, জলপিপি, জলময়ূরসহ বিভিন্ন দেশি জলচর পাখির পাশাপাশি বালি হাঁস, পাতি সরালি, বড়ো সরালি, পিয়াং হাঁস, খুন্তে হাঁস, ভূতি হাঁসসহ বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী হাঁস দেখা যায়। প্রায় শতাধিক পাখি ছাড়াও উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর বসবাস রয়েছে এসব জলাভূমিতে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানবসৃষ্ট চাপে এই জলাভূমিগুলোর জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে। অভয়ারণ্য ঘোষণার ফলে এখন থেকে এই এলাকা দুটিতে পাখি ও বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাস নিশ্চিত হবে। একইসঙ্গে শিক্ষার্থী, গবেষক ও প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হবে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী এই ঘোষণা কার্যকর হবে।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

ট্রাফিক ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শিক্ষার্থীরা নতুন বার্তা দিয়ে দেয়াল লিখন

‘ইতিহাসের নতুন অধ্যায় জুলাই’, ‘আইন প্রয়োগ করার আগে আইন পড়ুন’, ‘পানি লাগবে পানি’, ‘নতুন অধ্যায় জুলাই ২৪’– এমন নতুন বার্তা দিয়ে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন সড়কে ও দেয়াল লিখন কর্মসূচি পালন করেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

শুধু তাই নয়, নগরীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে এবং নিয়মনীতি মেনে সড়কে যানবাহন নিয়ন্ত্রণেও দায়িত্বে ছিলেন তারা। নগরের মোড়ে মোড়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কাজ দুই হাতে করতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। তাদের এমন ইতিবাচক কার্যক্রম নজর কেড়েছে অনেকের। কয়েকদিন আগেও যারা লাঠি হাতে অধিকার আদায়ে মাঠে নেমেছিলেন তাদেরকে ৭ই আগস্ট বুধবার এমন সব ভিন্ন ভূমিকায় দেখাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন নগরবাসী।

সরকার পতনের পর দেশে চলমান অস্থিরতায় দ্বিতীয় দিনের মতো চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। যেখানে ছাত্রদের পাশাপাশি ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও। নগরের এমএ আজিজ স্টেডিয়াম এলাকায় একদল শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান পরিচালনা করতে দেখা যায়। এসময় যত্রতত্র ময়লা না ফেলতে পথচারী ও সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করেন তারা।

স্টেডিয়ামের প্রধান ফটকের সামনের চতুর্মুখী সড়কে অবস্থান নিতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের আরও কয়েকটি টিমকে। প্রতিটি সড়কের গাড়িগুলোকে শৃঙ্খলার মাধ্যমে যাতায়াতের সুযোগ করে দেন তারা। এসময় মোটরসাইকেলে হেলমেট ছাড়া চলাচল করা অনেককে সচেতন করতেও দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার অনুরোধও করেন তারা।

নগরের খুলশী, প্রবর্তক মোড়, পাঁচলাইশ, জিইসি, ওয়াসা, কাজীর দেউড়ি, জামালখানসহ বেশ কয়েকটি সড়কে ও সড়কের পাশের দেয়ালে নতুন বার্তা সম্বলিত দেয়াল লিখন করতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। কিছু শিক্ষার্থীকে আবার নগরের বিভিন্ন স্থাপনার দেয়ালে আগে থেকে লেখা মুছে দিতেও দেখা যায়।

বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে দেশ কলঙ্কমুক্ত করেছে। আমরা চাই সুন্দর ও নিয়ম মেনে দেশ চলুক। গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে গোটা শহরে কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই। এই অবস্থায় নগর জীবনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকেই সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণে নেমেছি আমরা।

ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা দায়িত্বে না আসা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এই কাজটি চালিয়ে যাবেন। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানুষের পক্ষে থাকতে চায়। সবাই সচেতন হলে একটি সুন্দর দেশ গঠন করা সহজ হবে। নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে সাধ্যমতো পাশে থাকবে শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: সমকাল, ৭ই আগস্ট ২০২৪]

ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এক আলোকধারা

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

ইসলামের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা, যা 'কুরবানির ঈদ' নামেও পরিচিত। এটি মুসলিম জাতির আত্মত্যাগ ও নৈবদ্যের এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন। আরবি শব্দ 'আজহা' অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ বা কুরবানি। এই উৎসব মানবজাতির জন্য আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ ত্যাগের আদর্শ স্থাপনকারী হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-এর অবিচল আনুগত্যের এক মহিমান্বিত স্মৃতিচিহ্ন। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়বন্ধু হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর স্মরণ এখনো জারি রেখেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখবেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে, যা সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে চিরন্তন হয়ে ওঠে। তেমনি এক অমলিন মুহূর্ত হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সেই মহান আত্মত্যাগ,

যা আজও কোটি কোটি মানুষের জীবনে বয়ে আনে গভীর ভাবনার ঢেউ। এই অনন্য আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা।

ইসলামে কুরবানির ইতিহাস সুপ্রাচীন। পবিত্র ঈদুল আজহা তথা কুরবানির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা সংক্ষেপে উল্লেখ না করলে উক্ত আলোচনা অর্থহীন মনে হতে পারে। ইসলামের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়বন্ধু হজরত ইব্রাহিম-কে স্বপ্নযোগে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি কুরবানি করার নির্দেশ দেন। আদেশ হয়, 'তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে কুরবানি কর'। ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্নে এ আদেশ পেয়ে উট কুরবানি করলেন। পুনরায় তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। ইব্রাহিম আবার উট কুরবানি করেন। এরপরেও তিনি একই স্বপ্ন দেখে ভাবলেন, আমার কাছে তো এ মুহূর্তে প্রিয়পুত্র ইসমাইল ছাড়া আর কোনো প্রিয় বস্তু নেই। তখন তিনি পুত্রকে এ বিষয়ে অবহিত করলে ইসমাইল (আ.) সানন্দ চিত্তে রাজি হন এবং বলেন, 'পিতা, আপনি স্বপ্নে যা দেখেছেন, তা পালন করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন।'

এরপর পিতা এবং পুত্র আরাফাতের ময়দানে কুরবানির উদ্দেশে যাত্রা করেন। যখন ইব্রাহিম (আ.) আরাফাত পর্বতের উপর তাঁর পুত্রকে কুরবানি দেওয়ার জন্য গলদেশে ছুরি চালানোর চেষ্টা করেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন যে তাঁর পুত্রের পরিবর্তে একটি প্রাণী কুরবানি হয়েছে এবং তাঁর পুত্রের কোনো ক্ষতি হয় নি। তখন আল্লাহ তাআলা একটি মহান বার্তা পাঠান: ' হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলে। আমরা এই ত্যাগকে চিরস্মরণীয় করব।' এই ঘটনাকে স্মরণ করে সারাবিশ্বের মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিবছর এই দিবসটি 'ঈদুল আজহা' নামে উদ্‌যাপন করে থাকে। মূলত এই ঘটনাই কুরবানি বা ঈদুল আজহার মূল ভিত্তি। এটি কেবল এক ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি মানুষের ভেতরের অহম, কামনা, মোহ ও লোভের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের অনুশীলন।

ঈদুল আজহার সঙ্গে হজের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম এবং প্রতিবছর জিলহজ মাসের ৮-১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। হজযাত্রীরা ১০ই জিলহজ মিনা উপত্যকায় পশু কুরবানি করে ঈদুল আজহার অনুপম তাৎপর্য বাস্তবায়ন করেন। অপরদিকে, যারা হজে যেতে

পারেন না, তারা নিজ নিজ এলাকায় কুরবানি করে এই ত্যাগের আদর্শে শামিল হন। ঈদুল আজহার সঙ্গে হজের রয়েছে এক আত্মিক বন্ধন। যারা হজে গমন করেন তাদের জন্য ঈদুল আজহা মানে মিনায় কুরবানি, আরাফাতে কান্না, মুজদালিফায় রাত্রি যাপন, কাবা ঘর তাওয়াফ। যারা হজে যেতে পারেন না, তাদের জন্য কুরবানি মানে সেই আত্মত্যাগের সাথে হৃদয়ের সেতুবন্ধ রচনা করা, যা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের এক করে দেয়। ঈদুল আজহার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত আছে ত্যাগের এক বিশাল পাঠশালায়। কেবল পশু কুরবানি নয়, এইদিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রয়োজনে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটিকেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করতে হবে। হজরত ইব্রাহিম (আ.) যখন নিজের পুত্রকে আল্লাহর আদেশে কুরবানি করতে উদ্যত হন, তখন তা ছিল ঈমান, আনুগত্য ও ভালোবাসার চূড়ান্ত পরীক্ষা। সেই আত্মসমর্পণের স্মারক হয়ে আজও জগতে বাজে ঈদুল আজহার উদার আহ্বান।

ঈদুল আজহার মূল শিক্ষা হচ্ছে আত্মত্যাগ, আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য এবং সাম্যবোধ। কুরবানি মানে কেবল পশু জবাই নয়; এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো মানুষের ভেতরের পশুত্বকে বধ করা। অহংকার, হিংসা, লোভ, হীনমন্যতা ও বিদ্বেষের মতো নেতিবাচক গুণাবলিকে ত্যাগ করা। আল্লাহ কুরবানির পশুর গোশত বা রক্ত গ্রহণ করেন না, বরং তিনি মানুষের মনোভাব, তাকওয়া ও আত্মনিবেদনকে মূল্য দেন। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর কাছে পশুর গোশত বা রক্ত পৌঁছায় না, বরং পৌঁছে যায় তোমাদের তাকওয়া।' (সূরা হজ: ৩৭)

আল্লাহর কাছে কোনো বাহ্যিক প্রদর্শনী নয়, বরং হৃদয়ের গভীর আত্মনিবেদনই গ্রহণযোগ্য। কুরবানির মাধ্যমে যদি অহংকার, হিংসা, ভোগের মোহ ও স্বার্থপরতা জবেহ না হয়, তবে কুরবানি নিছক এক সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। তাই ঈদুল আজহা কেবল একটি পারিবারিক বা ব্যক্তিগত উৎসব নয়, এটি একটি সামাজিক সম্প্রীতির উদ্‌যাপন। কুরবানির গোশত তিন ভাগে বিভক্ত করে নিজের জন্য, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের জন্য এবং গরিব-দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা উত্তম। সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমানো হয় এবং এক ঐক্যবদ্ধ মানবিক সমাজ গঠনের প্রয়াস চালানো হয় কুরবানির মাধ্যমে। ঈদুল আজহার অন্যতম সৌন্দর্য হলো, এর সমাজভিত্তিক মানবিক বার্তা। এর মাধ্যমে সমাজে সাম্যবোধ গড়ে ওঠে এবং ঈদের আনন্দ হয় সবার জন্য সমান। এ উৎসব আমাদের শেখায়, খাঁটি ঈদ তখনই আসে যখন নিজের প্রাচুর্য অপরের মুখে হাসি ফোটায়।

আধুনিক বিশ্বে ঈদুল আজহার ত্যাগের দর্শন যেন আরও গভীর তাৎপর্য বহন করে। বৈষম্য, যুদ্ধ, লোভ ও আত্মকেন্দ্রিকতার এই সময়েও এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার চর্চাই মানবিকতার প্রকৃত প্রকাশ। ঈদের আনন্দ তখনই পূর্ণ হয়, যখন আমরা আমাদের কুরবানির আনন্দকে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি।

যখন আধুনিক সভ্যতা আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদ ও বৈষম্যের দিকে ছুটছে তখন ঈদুল আজহার ত্যাগের বার্তা হয়ে ওঠে এক বিপরীত ধারা, এক সামাজিক পুনর্জাগরণ। ঈদুল আজহার শিক্ষা আমাদের বলে, সত্যিকারের উন্নতি আসে আত্মসংযম ও ত্যাগের মাধ্যমে। আর সমাজ বদলায় ভালোবাসা ও সহানুভূতির আলোয়।

আর এসব কারণেই পবিত্র ঈদুল আজহা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুশীলন নয়; এটি একটি নৈতিক বিপ্লবের উৎসব। যেখানে মানুষের ভেতরের পশুত্বকে পরাজিত করে সত্য, ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠার শপথ নেওয়া হয়। এই দিনটি আমাদের শিক্ষা দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগে প্রস্তুত থাকা এবং সেই শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করাই মুসলমানের প্রকৃত কর্তব্য। পবিত্র ঈদুল আজহা আমাদের শুধুই আনন্দের নয়, এক আত্মশুদ্ধির উৎসব। এই দিনে আমরা যেন শুধু পশু নয়, নিজেদের ভেতরের পশুত্বকেও কুরবানি দিই। লোভ, হিংসা, অহংকার ও হীনমন্যতাকে জবেহ করে আলোকিত করি নিজের ভেতরের মানুষটিকে। এই ঈদ হোক আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসার, নিঃস্বার্থ ত্যাগের ও অন্তরের পরিশুদ্ধির এক জ্যোতির্ময় আরাধনা।

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ: সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

মাকে অপেক্ষায় রেখে চলে গেছেন ওমর

সরকার পতনের খবর পেয়ে রাজধানীর উত্তরায় আনন্দ মিছিলে যোগ দেন ওমর বিন নুরুল আবছার। নিজের ফেসবুক আইডিতে 'স্বাধীন' শব্দটি লিখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। এর পর মা রুবি আকতারের মোবাইল ফোনে কল করে হাসতে হাসতে বলেন, 'ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ করেছে। আমি বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় আছি মা, মিছিল করছি।' স্লোগান আর বাঁধভাঙা উল্লাসের তোড়ে ছেলের মুখের আর কোনো কথা তখন শুনতে পাননি রুবি আকতার। এরই মধ্যে লাইনটি কেটে যায়। কিছু সময় পর একজন কল করে বলেন, 'আপনার ছেলের গুলি লেগেছে, সে আর নেই।'

এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫ই আগস্টের দুপুর যেন থেমে গিয়েছিল রুবি আকতারের। যে ছেলে একটু আগেই এত উচ্ছ্বসিত ছিল, সে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আর নেই! এটা মানতেই পারছিলেন না তিনি। ছেলের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরও তার শেষ কথাগুলো কানে বাজছে মায়ের।

ওমরদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামে। তার বাবা নুরুল আবছার সৌদি আরব প্রবাসী। রুবি আকতার অন্য সন্তানদের নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ থানার ফরিদাপাড়া এলাকায় নিজেদের বাসায় থাকেন। তাদের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। নুরুল আবছারের স্বপ্ন ছিল, মেজো ছেলে ওমর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার হবে। সে লক্ষ্যে ঢাকার বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টারে (বিএটিসি) ভর্তি হন ওমর। সেখান থেকে এ বছরই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বের হওয়ার কথা ছিল। তা আর হয়নি। বুলেটে তার স্বপ্নযাত্রা থেমে গেছে।

গত ১৬ই আগস্ট শুক্রবার ফরিদাপাড়ার বাসায় গিয়ে দেখা যায়, শোকের ছায়া এখনও কাটেনি। ওমরের থাকার ঘরটি দেখিয়ে তার বই-খাতা হাতড়াতে শুরু করেন বাবা-মা। বুকে আঁকড়ে রাখছিলেন ছেলের ব্যবহৃত কাপড়।

অশ্রুসিক্ত চোখে রুবি আকতার বলেন, ওমর প্রায় সময় বলত, আর মাত্র কয়েকটা মাস মা। আরেকটু অপেক্ষা করো; এরপর ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকরিতে ঢুকে পড়ব। এ জন্য কয়েকটি এভিয়েশন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে যোগাযোগও করে রেখেছিল। কিন্তু এর আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

দূর প্রবাসে বসেই ওমরের মৃত্যুর খবর পান নুরুল আবছার। শেষবারের মতো ছেলের মুখটা দেখতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। তিনি ফেরার পর ৭ই আগস্ট ওমরকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[সূত্র: সমকাল, ১৯শে আগস্ট ২০২৪]

চট্টগ্রামের দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতি

শ্রাবণেই 'বসন্ত' নেমে এসেছে বাংলায়। তারুণ্যের রক্তে রাঙা বসন্তের ফুল আজ রঙে রঙিন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পতন হয়েছে ফ্যাসিস্ট সরকারের। ছাত্র-জনতার জয়ের হাসি ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে। আন্দোলনের সময়গুলোর সামনে বুক পেতে দেওয়া আবু সাঈদ, আলোচিত নানা স্লোগান, গুলিবিদ্ধ ছাত্রের মর্মস্পর্শী কথা আর স্মৃতি এখন ফুটে উঠেছে বন্দরনগর চট্টগ্রামের দেয়ালে দেয়ালে। রংতুলির মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলছেন দেশ কাঁপানো এই আন্দোলনে যুক্ত থাকা শিক্ষার্থীরা।

গত ৭ই আগস্ট বুধবার চট্টগ্রাম নগরের ২ নম্বর গেট, জিইসি মোড়, জামালখানসহ বিভিন্ন এলাকায় দেয়াল ও উড়াল সড়কের পিলারে রঙিন সব ছবি এঁকেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে চট্টগ্রাম পুনঃসংস্কার এবং বিজয়ের গ্রাফিতি কর্মসূচি নিয়ে একটি পোস্ট দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রামে পোস্টার সরানো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুড়ে যাওয়া দেয়াল রং করার আহ্বান জানিয়ে এই পোস্ট দেওয়া হয়ে; যা ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

চট্টগ্রাম নগরের জিইসি মোড়ে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের দেয়াল ছিল স্যাঁতসেঁতে আর পোস্টারে ঢাকা। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় সৌন্দর্য হারায় এই দেয়াল। শিক্ষার্থীরা শুরুতেই সাদা রং দিয়ে পরিষ্কার করেন এই দেয়াল। তারপর ছবি আঁকার মাধ্যমে আন্দোলনের দৃশ্যচিত্র ফুটিয়ে তোলেন। আঁকা হয় জাতীয় পতাকা। লেখা হয় আন্দোলনে মারা যাওয়া ছাত্রদের নাম।

দেয়ালে দেয়ালে ছিল নানা স্লোগান। 'স্বাধীনতা এনেছি যখন, সংস্কার করি'; 'ইতিহাসের নতুন অধ্যায় জুলাই ২৪'; 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো জুলাই'; 'আমাদের দেশের ভাগ্য আমরা পরিবর্তন করব'; 'আমাদের দেশ আমাদেরই গড়ে নিতে হবে, পিণ্ডির গোলামি ছেড়ে দিতে হবে' ইত্যাদি।

'ভাই কারও পানি লাগবে, পানি...-' কোটা সংস্কার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মীর মাহফুজুর রহমানের (মুগ্ধ) এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আন্দোলনে মৃত্যু হলেও মুগ্ধর এমন কথা ভুলে যাননি আন্দোলনকারীরা। পরবর্তী কর্মসূচিগুলোতে বার বার ফিরে আসে 'পানি লাগবে পানি...'। বিজয়ের পরও তা স্মৃতিতে গেঁথে রয়েছে

হয়েছিলেন। নগরের দেয়ালগুলোতে নানা ধরনের লেখা ছিল, যা দৃষ্টিকটু ও সমীচীন নয়। তাই এসব লেখা মুছে নতুন করে রাঙানোর কাজ করছি। তুলে ধরছি আন্দোলনের নানা স্মৃতি। যাতে পথচলতি শিশু-কিশোর থেকে বয়স্ক– সবাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি ভুলে না যান, সে জন্য গ্রাফিতি আঁকছি।'

আন্দোলনকারীদের মধ্যে। সাদা দেয়ালে রক্তে রাঙা লাল কালি দিয়ে তাই লেখা হয়েছে, 'পানি লাগবে পানি...'।

ফেসবুকে পোস্ট দেখে জিইসি মোড়ে গ্রাফিতি আঁকতে চলে এসেছিলেন আহনাফ তাহমিদ। ছবি আঁকায় প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি না থাকলেও কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী সাদিয়া নাজনীন। তিনি বলেন, 'দেয়ালগুলো খুব বেশি নোংরা ছিল। দেখতে ভালো লাগছে না। আর শিক্ষার্থীরা একটি সুন্দর বাংলাদেশের জন্য

চট্টগ্রাম কলেজের ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র আহনাফ নিজেই নিয়ে এসেছিলেন রংতুলি। আহনাফ বলেন, 'আমরা সবাই মিলে এই আন্দোলন করেছি। সাধারণ মানুষও যুক্ত আন্দোলন করেছেন। তাই যে-কোনো ধরনের ময়লা-আবর্জনা আর খারাপ ধারণা মুছে দিতে চাই। আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই।'

[সূত্র: প্রথম আলো, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

জুলাই আন্দোলনে বীর কন্যা শহিদ নাঈমা সুলতানা

মিয়াজান কবীর

পদ্মা-মেঘনা-ডাকাতিয়া নদীর ত্রিমোহনায় গড়ে উঠেছে বন্দরনগরী চাঁদপুর। চাঁদপুরের মতলব উত্তরের একটি গ্রাম আমুয়াকান্দা। এই আমুয়াকান্দা গ্রামে ২০০৯ সালের ২৫শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন নাঈমা সুলতানা। তার বাবার নাম গোলাম মোস্তফা আর মায়ের নাম আইনুন নাহার। এই দম্পত্তির দুই মেয়ে, এক ছেলে। তাদের মধ্যে নাঈমা সুলতানা দ্বিতীয় সন্তান।

নাঈমা সুলতানা ছোটোবেলা থেকেই চটপটে, হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন। চটপটে এই মেয়েটি মায়ের কাছে বর্ণমালা লিখতে ও পড়তে শিখেন। ছয় বছর বয়সে নাঈমাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় থেকে ২০১৯ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে জিপিএ ফাইভ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তারপর ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন আলহাজ্ব তোফাজ্জল হোসেন ঢালী উচ্চ বিদ্যালয়ে।

নাঈমার বাবা একজন হোমিও ডাক্তার। বাবার মানব সেবামূলক ডাক্তারি পেশার প্রতি নাঈমার দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। তাই তিনি চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক্তার সেজে সহপাঠী ও শিক্ষকদের হতবাক করে দিতেন তিনি। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুরেলা কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করতেন। স্কুলে অ্যাসেম্বলিতে সহপাঠীদের সঙ্গে সমস্বরে গাইতেন জাতীয় সংগীত।

নাঈমা সুলতানা ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্রী। তার মেধা ও মনন বিকাশের লক্ষ্যে বাবা-মা তাকে নিয়ে আসেন ঢাকায়। নাঈমা সুলতানাকে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে গড়ে তুলেন মধুর সম্পর্ক। বড়ো বোন তাসপিয়া ও ছোটো ভাই রাফির সঙ্গেও ছিল নাঈমার মমতামাখা দৃঢ়বন্ধন।

নাঈমা সুলতানা ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি রংতুলিতে কোমল হাতে আঁকতেন বিভিন্ন ধরনের ছবি। তিনি সতীর্থদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতেন। সহপাঠীদের প্রতি ছিল তার স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা। স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে টিফিন খেতেন। শুধু তাই নয়, আলাপ-আলোচনায় সহপাঠীদের মনে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতেন। ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার লক্ষ্যে সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনা করতেন নাঈমা সুলতানা।

২০২৪ সালের জুলাইতে যখন কোটাবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়, তখন নাঈমা সুলতানা তার সহপাঠীদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। ফেসবুকের মাধ্যমে আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস পোস্ট করতে থাকেন। সেই সাথে আন্দোলনে অংশ নিতে মা এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করেন। দেশের পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় কারো কিছু বলার ছিল না। তাই নাঈমা সুলতানা কারও কাছে কোনো সাড়া না পেয়ে তার মন বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশ আর ছাত্রলীগের তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে সমগ্র দেশ। সেই সাথে জনজীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ! তখন নাঈমা সুলতানা হাতে তুলে নেন রংতুলি। তিনি একজন

চারুশিল্পী। তাই রংতুলিতে আঁকতে থাকেন আন্দোলনের চিত্রগাথা। ১৫ই জুলাই তিনি নিজের হাতে রংতুলিতে আঁকেন আন্দোলনের বাস্তবতার ছবি। ছবির ক্যাপশনে লিখলেন– 'আন্দোলন হবে এবার রংতুলিতে'। সেইসঙ্গে আরও লিখলেন– 'কোটা প্রথা নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক।' এ যেন শুধু এক নিছক ছবি নয়; এ যেন আন্দোলনের এক মহাকাব্য। ফেসবুকে তার আঁকা এই ছবিটি পোস্ট করা হলে জাগরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশ আর ছাত্রলীগের রোষানলে পড়েন নাঈমা সুলতানা।

সারাদেশের মতো ঢাকার উত্তরায়ও আন্দোলনের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে। রক্তাক্ত হয় মীর মুগ্ধর মতো অনেক শহিদের বুকের তপ্ত রক্তে। ১৯শে জুলাই পুলিশ আর ছাত্রলীগের তাণ্ডবলীলায় উত্তরা জনপদও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। রক্তে ভেসে যায় উত্তরার পলিমাটি। উত্তরার নয় নম্বর সেক্টরের আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মোড় থেকে পুলিশ আর ছাত্রলীগ গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগোতে থাকে নাঈমা সুলতানার বাসার দিকে। সংগ্রামী ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলে পেটুয়া পুলিশ আর ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। এক সময় সংগ্রামী ছাত্র-জনতা কৌশলগত কারণে পিছিয়ে নাঈমাদের বাসার নীচে আশ্রয় নেন। জানালা দিয়ে এ দৃশ্য দেখে নাঈমা সুলতানা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাই নাঈমা চার দেয়ালের ভেতরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেননি। সংগ্রামীদের প্রতি সহানুভূতিতে তিনি তার চারতলার বাসার বারান্দায় এসে দেখতে থাকেন সংগ্রামীদের হালচাল। এমন সময় পুলিশ নাঈমাকে লক্ষ্য করে মাথায় গুলি ছুড়ে। গুলির আঘাতে নাইমার মাথার খুলি ফেটে মগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে বারান্দার ওপর। মা আইনুন নাহার নাঈমার বুকফাটা আর্তনাদে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন মেয়েকে। মায়ের ডাক-চিৎকারে এগিয়ে আসেন ছাত্র-জনতা। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় নাঈমাকে নিয়ে যায় উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স, ছাত্রছাত্রীরা নাঈমাকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্দয় বুলেটের আঘাতে বাঁচাতে পারেননি নাঈমাকে। মা, ভাইবোন, প্রিয়জন নাঈমাকে হারিয়ে অঝোরধারায় কান্নায় ভেঙে পড়েন। নাঈমার শহিদ হওয়ার খবর পেয়ে গ্রাম থেকে তার এক চাচা রোগী সেজে অ্যাম্বুলেন্সে স্বজনদের নিয়ে চলে আসেন নাঈমাদের বাসায়। তারপর পুলিশ আর ছাত্রলীগের বাধা পেরিয়ে নাঈমার নিথর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তার জন্মস্মৃতি আমুয়াকান্দা গ্রামে। এই জন্মস্মৃতি গ্রামে যেখানে তার নাড়ি প্রোথিত সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের এক বীর কন্যা নাঈমা সুলতানা।

নাঈমা সুলতানা একজন চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন ২০২৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিবেন। সে স্বপ্ন তার পূরণ হলো না। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো তার স্বপ্নগুলো।

নাঈমা সুলতানা একজন মেধাবী ছাত্রী, এক সংগ্রামী কিশোরীর নাম। নাঈমা সুলতানা একজন চারুশিল্পী। যার রংতুলিতে আঁকা ছবিতে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল বঙ্গোপসাগর থেকে হিমালয়ের পাদদেশে। রংতুলিতে এঁকেছিলেন কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা– 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা।' নাঈমা সুলতানার মতো শত শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে মুক্ত হয়েছে এ দেশ, এ মাটি। স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট সরকারের অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি পেয়েছে এ দেশের নিপীড়িত মানুষ। এখনও শহিদের রক্তের দাগ মুছে যায়নি, মুছে যায়নি মা-বাবা, ভাইবোন, প্রিয়জনের কান্নার জলরাশি। আজও বাংলার আকাশে-বাতাসে শোনা যায় মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ, বোনের বিলাপ, ভাইয়ের বিচারের দাবি। এই বিচারের দাবি মা-বাবা, ভাইবোন সমগ্র দেশবাসীর। স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট সরকারের আর তার পেটুয়া বাহিনীর বিচারের দাবি ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রিয়জনের আর্তনাদে।

চব্বিশের জুলাই আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। স্বৈরাচারের আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করতে এই আন্দোলনে নাঈমা সুলতানার মতো শত শত বীর সন্তানেরা আত্মোৎসর্গ করেছেন। এই বীরদের স্মরণে দেয়ালে দেয়ালে রংতুলিতে আঁকা হয়েছে নানা ধরনের গ্রাফিতি। শিল্পীর আঁকা গ্রাফিতিতে রক্তাক্ত আন্দোলনের স্মৃতি ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক

শোনো মহাজন,
আমি নয়তো একজন
শোনো মহাজন,
আমরা অনেকজন !!!

FIGHT FOR YOUR RIGHT

প্রথম কদমফুল

রফিকুর রশীদ

আমি তার নাম রেখেছিলাম মেঘনীল।

স্কুল-কলেজের খাতায় তোলা নামের পাশাপাশি খুব ছোটো একটা আটপৌরে ডাকনামও ছিল তার। বেশ মিষ্টি। খানিকটা আদুরে আদুরে শব্দ নীপা। কিন্তু ওই আদুরে নামে আমার মন ভরেনি। পরিচয়ের পর থেকে আমি তাকে ওই নামে ডাকিনি বললেই চলে। নীপা শব্দের অর্থ কী! এতদিন ধরে এই নাম যে বয়ে বেড়াচ্ছে তা সে মোটেই জানে না, কখনো জানতে চেষ্টাও করেনি। আমি বলি- ডিকশনারি খুলে দেখো। নিজের নাম নিয়ে সামান্য একটুখানি কৌতূহল থাকতে নেই!

তখনকার দিনে আমাদের সেই ছোট্ট মফস্বল শহরে বাংলা অভিধান মোটেই সুলভ ছিল না। ডিকশনারি বলতে এ.টি. দেবের ইংলিশ টু বেঙ্গলি কিংবা বেঙ্গলি

টু ইংলিশ কারও কারও ঘরে পাওয়া যেত। নীপা কোথায় পাবে বাংলা অভিধান! অগত্যা সেই সহযোগিতাও আমি করি। আমাদের বাবা শব্দভুক শিক্ষক, অবসর সময়ে শব্দ নিয়ে খেলতে ভালোবাসেন, শব্দের গায়ে শব্দ ঘষে পাথরে পাথর ঠুকবার আনন্দ পান। সেই সুবাদে বাবা কাচভাঙা আলমারিতে বহু ব্যবহৃত ডিকশনারি আছে বেশ কয়েকটি। তারই মধ্যে থেকে সংসদ বাংলা অভিধান আমি বের করে এনে দিই।

নিজের নাম নিয়ে নীপা তখন মহা বিপাকে। রোজ বিকালে সে আসে আমাদের বড়ো বোনের কাছে নজরুলগীতি শিখতে। ধারে কাছে ওস্তাদ বলতে তেমন কেউ নেই। বাবার উৎসাহে এবং নিজের চেষ্টায় বড়োবু রীতিমতো শিল্পী হয়ে উঠেছে, রেডিওতে অডিশন দেবারও স্বপ্ন দ্যাখে। নজরুলগীতি তার প্রিয় প্রসঙ্গ। তবে কলেজে কিংবা শহরের অন্যান্য ফাংশনে শ্রোতাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে নজরুলগীতির বাইরেও দু'চারটি গান পরিবেশন করে। বড়োবুর গানের ছাত্রী নীপা। শুনেছি ফুড অফিসারের মেয়ে। কী খাদ্য যে খায় সে-ই জানে, স্বাস্থ্য বলতে পাতলা লিকলিকে তালপাতার সেপাই, দেখতে কৃষ্ণকলি ; কিন্তু কণ্ঠ তার সন্ধ্যা মুখার্জির কাছাকাছি প্রায়। আমাদের অনুরোধে একদিন সে 'আষাঢ়-শ্রাবণ মানে না তো মন' গেয়ে শুনিয়েছিল। বাব্বা! নেহায়েত চোখের সামনে নীপা উপস্থিত ছিল তাই রক্ষা, না হলে সন্ধ্যার কণ্ঠ বলেই সবার ভ্রম হতো।

নীপার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিন, আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে সেটা ছিল 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস'। না না, তখনো কালিদাসের মেঘদূত-টেঘদূত কিছুই চিনি না। এটা সংস্কৃত কবি কালিদাসের বাক্য, সে কথা অনেক পরে জেনেছি। তখন সবে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, বিদ্যের দৌড় আর কতই হবে! তবে সেদিন কলেজে গিয়ে আমাদের কমনরুমে খবরের কাগজের একেবারে প্রথম পাতায় মোটা হরফে লেখা দেখেছিলাম– আষাঢ়স্য প্রথম দিবস। আরও শৈশবে বাংলার ষড়ঋতুর পরিচয়ে জেনেছি আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। কিন্তু সেদিন বর্ষা বা বৃষ্টি কিছুই ছিল না। গোমরামুখো আকাশ নুয়েছিল মাথার উপরে। রোদ নেই, কেমন যেন ছায়া ছায়া পরিবেশ, আবার গুমোট গরম। সেদিন বৃষ্টি নামল শেষে বেলা গড়ানো বিকেলে। তড়িঘড়ি করে আমি বাইরে যাবার জন্য দরজা খুলতেই দেখি বৃষ্টি নেমে গেছে ঝিরিঝিরিয়ে, আর সেই বৃষ্টির রেণু উড়ু উড়ু চুলে এবং সারা গায়ে মাখিয়ে নীপা দাঁড়িয়ে কদমতলায়।

এই মেয়েটিই যে নীপা, এমন নির্দিষ্ট করে তখনো আমি তাকে চিনি না। বড়োবুর কাছে গান শিখতে আসা মেয়ে, সেটুকু আমি বুঝতে পারি। বিকেলের ব্যাচে বড়োবুর কাছে আসতে দেখেছি বলে মনে হয়। আসলে বিকেল আমাকে টানে খেলার মাঠে। সেটা ফুটবলেও আপত্তি নেই, তবে ক্রিকেটেই বিশেষ আনন্দ। এদিকে আমাদের বড়োবু স্কুল-পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি সংগঠন খুলেছে, বিকেলে হয় তাদের রিহার্সাল। সমবেতকণ্ঠে কোরাস গায়– ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। নীপাদের মতো উঁচু ক্লাসের কয়েকটি ছাত্রীর জন্য বড়োবু ওরই মধ্যে আলাদা করে সময় দেয়, কিন্তু ছোটোদের আবৃত্তি শেখানোর ভারটা সে বরাবরই আমার কাঁধে চাপাতে চায়। আমি ওভাবে গৃহবন্দি হয়ে বিকেলটা মাটি করতে রাজি নই। তাছড়া আবৃত্তির এমন কীইবা আমি জানি! ছোটোবেলা থেকে বাবার গমগমে কণ্ঠে শুনে আসছি– 'ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো নন পাখা...' অথবা 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিবাইছে তব আলো/ তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো, তুমি কি বেসেছ ভালো?' এভাবে শুনতে শুনতেই আমরা ভাইবোনেরা অনেক কবিতা মুখস্থ করে ফেলেছি। কাজী নজরুলের 'মানুষ', 'নারী' এমন কি 'বিদ্রোহী' কবিতারও অংশ বিশেষ আমাদের মুখস্থ করতে হয়েছে বাবার চাপেই। তা কবিতা মুখস্থ আর আবৃত্তি কি এক কথা হলো! বড়োবু কিন্তু নাছোড়– না, তোর ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি খুব ভালো হয়, তুই আবৃত্তির দায়িত্বটা নে দেখি!

–ভরাট কণ্ঠ!

বড়োবুর কথা শুনে আমার হাসি পায়। এ আমার কুড়িয়ে পাওয়া ধন। আসলে কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছি এই বাচনভঙ্গি, এই উচ্চারণ-কণ্ঠস্বর। বাবার ইচ্ছে, আমি যেন

রবীন্দ্রসংগীত শিখি। তার পছন্দ পূজা ও প্রার্থনা পর্বের গান এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি পর্যায়ের মধ্যে বাদল দিনের গানও। ঘরকন্নার মাঝে ডুবে থাকা আমাদের নির্বিবাদী মায়ের কাছে খেয়ালি আবদারও জানাতে দেখেছি আমাদের বাবাকে। ছুটির দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামতে দেখে মন তার হয়ে ওঠে শ্রাবণ মেঘের সঙ্গী। তখন স্ত্রীকে তোয়াজ করে, গাও না পারুলের মা– 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে, দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে, ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটি।' বাবাকে আমরা বহুদিন গুনগুন করতে শুনেছি, কিন্তু মাকে তো কোনোদিন কোনো গান গাইতে শুনিনি। অথচ সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমাদের সেই সংগীতবিমুখ মা-ই কিনা একদিন বলে বসে, খোকা তুই রবীন্দ্রসংগীত শিখলেই তো পারিস। তোর বাপের সাধ তো পূরণ হয়!

রবীন্দ্রসংগীত কিংবা আবৃত্তি কোনোটিতেই আমার আগ্রহ কম কিছু আছে এমন কিন্তু নয়, তবে সবার উপরে খেলার মাঠ। রোদ-বৃষ্টি কী ঝড়-বাদলা কিছুতেই আমাকে রুখতে পারেনি, বিকেল হলে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি ঠিকই। কিন্তু সেদিন সেই বাদলা বিকেলে কী যে হলো! দরজা খুলতেই কদমতলায় আমার দুচোখ আটকে গেল ,পা দুটি থমকে দাঁড়ালো; বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তো ছিলই, বৃষ্টিভেজা মেয়েটির চোখে চোখ পড়তেই আমার বুকের ভেতরে শুরু হলো ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি। কে যে কবে রাস্তার পাশে এই কদমগাছ লাগিয়েছিল জানি না, বর্ষা এলেই দেখি নতুন জীবন পায়, সবুজ পাতার ফাঁকে ফুলে ফুলে হেসে ওঠে তার সারা শরীর; আলোকিত করে তোলে দশদিগন্ত। বৃষ্টিধোয়া কদমফুল নাকি বৃষ্টিভেজা নীপা– কে যে আমার ধমনিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, আমি টের পাই আমার রক্তের প্রবাহে শুরু হয়েছে উত্তাল তোলপাড়। আমি স্থির হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই কদমতলায়, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি,

তুমি বড়োবুর ছাত্রী না?

মুখে রা কাড়ে না, সে ঘাড় নাড়িয়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ। ঠিক কোথায় সাদৃশ্য সে কথা পুরোপুরি বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে এতক্ষণে বৃষ্টিভেজা কদমফুলের সঙ্গে তার মুখের আদরটুকু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলি,

তা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন? ভেতরে যাও।

আমার বোধ হয় বেশ খানিকটা দাদাগিরি ফলানো হয়ে যায়, অসময়ের গার্জেনগিরিও বলা যেতে পারে; মেয়েটি ভীরুপায়ে ঢুকে যায় বড়োবুর গানের ঘরে। শ্রাবণ মেঘের আওলা সরে গেলে বৃষ্টি ধরে আসে ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটির গায়ের আসমানি রঙের জামা ওড়না ভিজে সারা। আসমানি রং মানে তো সেই আকাশের রং। সেটা তবে কোন আকাশ–

শরতের নির্মেঘ আকাশ, নাকি বর্ষার নতমুখী মেঘলা আকাশ! মনে পড়ে ব্যাকরণে শিখেছিলাম: নীল যে অম্বর- নীলাম্বর। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে মেঘনীল রঙের কথা আছে। 'পরো গেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ।' তবে কি সেদিন সে ওই মেঘনীল বেশই পরেছিল!

সেবারই নীপা স্কুল ফাইনালের পাঁচিল টপকে কলেজে চলে এলে আমি সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেলাম। আমাদের মধ্যে ব্যবধান আসলে এক বছরের। তবে সেটা চোখে পড়ত স্কুল আর কলেজের মধ্যে দূরত্বের কারণেই। নীপা কলেজে চলে আসার ফলে অতি দ্রুত সেই দূরত্ব ঘুচে গেল। অথচ বড়োবুর গানের ক্লাসে সেভাবে বসলে এ দূরত্ব আরও আগেই মোচন হবার কথা। বাস্তবে কিন্তু তেমন হয়নি। সেই বৃষ্টিভেজা মুখ প্রতিনিয়ত টেনেছে, ভেতরে ভেতরে শেকড়বাকড় উপড়ে ফেলার জোগাড় হয়েছে; তবু বড়োবুর গানের ঘরে আর সহজভাবে ঢুকতেই পারিনি। রাজ্যের সব দ্বিধা সংকোচ এসে দু'পায়ের গতি রোধ করেছে, বুকের মধ্যে হাজারটা হাতুড়ির বাড়ি পড়েছে। তবু সত্যি যা সেটুকু কবুল করতে দ্বিধা নেই, দেখতে যতই কৃষ্ণকলি হোক না কেন তার ওই কদম কদম মুখটা না দেখলে আমার দিনের প্রহর ভারি হয়ে যেত, রাত্রি পাড়ি দেয়া যেন বা সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মতোই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠত।

সেই নীপা কলেজে ভর্তি হবার পর কেমন করে যেন এক লাফে বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে এলো, হোক এক

বছরের ছোটো-বড়ো তবু সম্পর্কটা সহসা বন্ধুত্বের মতোই হয়ে গেল। সম্পর্কের এই নতুন মাত্রা রচনার জন্য আমি তো হাত বাড়িয়েই ছিলাম, কে জানে ভেতরে ভেতরে তারও কোনো প্রস্তুতি ছিল কি না! এই কলেজ-অধ্যায়ের একেবারে সূচনাপর্বেই তাকে নামের অর্থ নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল। সংসদ বাংলা অভিধান ঘেঁটে কোথাও নীপা পাওয়া যায় না। কী আশ্চর্য! তবে কি অর্থহীন এক শব্দের ভার অকারণেই বয়ে চলেছে নীপা! হ্যাঁ পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পাওয়া গেল নীপ, নীপবন; অর্থ হলো তমাল তরু। না না, এতদিন পরে ভুল হচ্ছে; নীপ মানে 'কদমফুলের গাছ'। অভিধানে কদমগাছের কথাই লেখা আছে। কিন্তু নীপা! এ কি তবে 'নীপ' শব্দেরই লিঙ্গান্তর? তা নীপা কি নিজেকে কদমগাছের সঙ্গে তুলনীয় ভাবতে রাজি? আমি তো তার দিকে তাকালে সেই বৃষ্টিধোয়া কদমফুলই দেখতে পাই, সারা শরীরভরা বৃষ্টিরেণু, কী যে মিষ্টি সেই দৃশ্য!

বিপন্ন নীপাকে উদ্ধারের জন্য আমিই তখন এগিয়ে আসি। সুহৃদ বান্ধবের মতো বুঝিয়ে বলি, মানুষের তো কত রকম নামই থাকে, কোনোটা ঘরে ব্যবহারের, কোনোটা বাইরে ব্যবহারের। কোনোটা শুধুই বাবার, কোনোটা মায়ের, কোনোটা ভাইয়ের ; আবার বন্ধুবান্ধবের ইয়ার্কি-ঠাট্টাতেও কারও নাম ভেঙেচুরে দুমড়ে-মুচড়ে অন্যরকম হয়ে যায়। নীপা হেসে ওঠে আমার বিবরণের ভঙ্গি দেখে। তখন আমি আরও তৎপর হই, মুখে আঙ্গুল তুলে বলি,

হেসো না হেসো না খুকি, শোনো।

নীপা হাসতেই থাকে। যেন বিকেলের তাপহীন রোদ্দুরে গড়িয়ে পড়ে মুক্তোদানা। ঝলমলিয়ে ওঠে চতুর্দিক। আমি সেই হাসির রেণু গায়ে মেখে প্রস্তাব রাখি,

আমি বরং তোমাকে একটা নতুন নাম দিই।

প্রস্তাব শুনে হাসির লাগামে টান পড়ে। মুখে কিছুই বলে না। তার দুচোখের পাতা কেঁপে ওঠে তিরতিরিয়ে। এ যে তার সম্মতি নাকি অসম্মতি, আমি কিছুই বুঝতে পারি না খুব বিনম্রভাবে জিজ্ঞেস করি,

সেই কবে থেকে ভেবে ভেবে আমি একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। বলব সেই নামটা?

নাহ, নীরবতা ভাঙে না নীপা। কিন্তু আমি তার চোখের তারায় চোখ রাখতেই ঠিক উত্তর পেয়ে যাই। দেখি তার দুচোখের পুতুল ঘাড় দুলিয়ে নেচে নেচে সম্মতি জানাচ্ছে, রীতিমতো প্ররোচিত করছে —কই বলো বলো, নতুন নামটা বলো শুনি!

আমি খুব সযত্নে উচ্চারণ করি,

মেঘনীল।

নীল নয়, চেয়ে দেখি নীপা লাল হয়ে গেছে লজ্জায়। গায়ের রং তার ফর্সা নয় মোটেই, তবু নতুন নামকরণে চোখে-মুখে লালিমার আভা ঠিকই ছলকে উঠেছে। আমি রাবীন্দ্রিক শুদ্ধতায় আবারও উচ্চারণ করি 'মেঘনীল'। তারপর জানতে চাই, পছন্দ হয়েছে তোমার?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে নীপাই আমাকে জিজ্ঞেস করে,

এখন থেকে সবাই তাহলে এই নামে ডাকবে আমাকে?

না না, তা হবে কেন! আমি প্রতিবাদ করি—সবাই ডাকবে কোন অধিকারে? ওটা তো শুধুই আমার ডাকার জন্য।

একার জন্যই একটা নাম! নীপা যেন বিস্মিত হয়। আমি সোজা জানিয়ে দিই, হ্যাঁ, শুধুই আমার জন্য। তবে কেউ যদি তোমাকে আমার মতো ভালোবাসে, তাহলে ডাকতে পারে ওই নামে, আপত্তি নেই। ওটা ভালোবাসার নাম।

এবার মেঘনীল আর লাল নয়, যথার্থ নীল হতে শুরু করে। কথায় উড়ে যায় উচ্ছ্বসিত হাসির পেঁজা তুলো, সারামুখে ঘনিয়ে আসে মেঘ। সহসা এই রংবদলের দৃশ্য দেখে আমারও ভাবনা হয়, জিজ্ঞেস করি,

—কী হলো হঠাৎ!

—আমার খুব ভয় করছে।

সত্যি অবাক কাণ্ড! এরই মাঝে তার চোখের কোণে উথলে ওঠে শ্রাবণজলের অশ্রুদানা। এমন অশ্রুপাতের কী যে মানে, আমার জানা নেই। এর

মধ্যে ভয় ভীতিই বা ঢুকল কেমন করে আমি তাও ভেবে পাই না। অবাক হয়ে শুধাই, কী বলছ তুমি?

না, সেদিন আর কথা হয় না।

অথচ ভীতুর ডিম সেই মেয়েটি কিন্তু ঠিকই রবীন্দ্রনাথের গানের শরীর ঘেঁটেঘুঁটে কয়েকদিনের মধ্যে আবিষ্কার করে বসে 'মেঘনীল' শব্দটি আমি কোত্থেকে সংগ্রহ করেছি। আমাকে অবাক করে দিয়ে একদিন সে দিব্যি গুনগুনিয়ে ওঠে– ' এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে– ।'

বড়োবুর কাছে সে নজরুলগীতির তালিম নেয় আমি জানি, তাই বলে রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর উপরেও এতটা দখল থাকবে আশা করিনি। ওই গানেই আছে – 'দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ... ।'

অতপর সহসা একদিন মেঘনীল আমার চোখেমুখে তার ঘন কালো কেশ এলিয়ে দিয়ে অন্ধকার করে দেয় আমার পৃথিবী। সামনে আমি আর এক বিন্দুও আলোর আভাস দেখতে পাই না। অথচ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা তখন ঘরের দুয়ারে। আমি যাই কোথায়, কী করি! সরকারি চাকরিজীবী বাবার বদলির সুবাদে আমার আকাশে বিষাদের নীল রং ছড়িয়ে দিয়ে মেঘনীল চলে গেল বহুদূরে। আমার কিছুই করার থাকল না। মাথার ওপরে শ্রাবণ আকাশ দম ধরে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

জীবন তবু থেমে থাকেনি কারও। ঘন মেঘের আড়ালের কারণে সাদা চোখে দেখা যাক বা না যাক, নক্ষত্ররাজি আপন অস্তিত্বে ঠিকই থাকে বিরাজমান; জীবন কেন শুধু মুহ্যমান! জীবনের দাবি জীবন ঠিকই আদায় করে নেয়, তার কাছে কোনো, ক্ষমা নেই। বাবার নতুন কর্মস্থল থেকে দু-চার দফা চিঠি লিখে নীপা খুব ক্ষমা-টমা চায়। চিঠি তো নয়, শ্রাবণজলে ভেজা কদমপাতা। কতদিন কতরাত ভেবেও আমি জবাব লেখার ভাষা খুঁজে পাইনি। এ জীবনে নিজের বহু বোকামির কারণ অনুসন্ধান করে পরে নিজেই হেসেছি, বোকার মতোই হেসেছি, কিন্তু যৌবনের শুরুতে ভালোবাসাবাসির নামে যে ঘূর্ণিপাকের খেলায় আমি নেমেছিলাম, সে খেলার পরিণাম যে এমনি হতে পারে, ভাবতেই পারি না– সে কথা কেন একবারও মাথায় আসেনি? প্রথম প্রেম কি তবে এতটাই অবুঝ হয়!

আমি এখন একটা দৈনিক কাগজের অফিসে কাজ করি। সাংবাদিক। প্রিয়-অপ্রিয় বিবেচনা নেই, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ লিখতে হয়। সপ্তায় দুটো সাবএডিটোরিয়ালও। কোথায় আমার আবৃত্তি, কোথায় আমার রবীন্দ্রসংগীতের কণ্ঠ, কোথায় আমার খেলার মাঠ! আমাদের সেই ছোট্ট মফস্বল শহরের আনন্দ কোলাহল, হইহল্লা, দুঃখ-বেদনা সব চাপা পড়ে গেছে রাশি রাশি নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত কালো অক্ষরের আড়ালে। দিনশেষে গভীর রাতে অফিস থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরি হাই তুলতে তুলতে। খাবার টেবিলে ভাত-তরকারি এগিয়ে দেবার পর মা আমাকে প্রায়ই বিয়ের তাড়া দেয়। তার সব ছেলেমেয়ে বিয়েথা করে সংসারী হয়েছে, চিন্তা শুধু আমাকে নিয়ে। আমার বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ তুলে দিতে পারলে সে ফিরে যাবে আপন সংসারে। বাবা নেই, বাড়িতে এখন ভাই-বোনেরা কেউ থাকে না, তবু তাকে সেখানেই যেতে হবে। একা একাই থাকবে, এই তার ইচ্ছে। আমার জন্যেই সেটা হচ্ছে না। কিন্তু আমিই বা কী করতে পারি! বিয়ে করার মতো জরুরি কাজটাই যে কেন হয়ে উঠছে না তার উপযুক্ত কারণ আমি নিজেই নির্ণয় করতে পারি না, মাকে আর কত মিথ্যে অজুহাত দেখাব!

শুক্রবার আমার ডে-অফ। দেরি করে ঘুম থেকে উঠি। চা খাই। কাগজ পড়ি। বাথরুমে যাই। রুটিনটা এ রকমই। গত শুক্রবারে সকালে চোখ মেলতেই দেখি বাইরে তুমুল বৃষ্টি। কাগজ হাতে নিয়ে চমকে উঠি, সেই পুরানো শিরোনাম– 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস।' পাশেই ছাপা হয়েছে কদম ফুলের রঙিন ছবি। নতুন বলতে এই ছবিটুকুই। ভেতরে সেই একই গৎবাঁধা কথা, ব্যক্ত হয়েছে চির পুরাতন সেই প্রত্যাশা– 'নব ধারাজলে স্নাত হয়ে উঠুক ধরণী...'। বর্ষ শুরুর দিনটি শুক্রবার হবার ফলে সাহিত্য সাময়িকীতেও তার প্রভাব পড়েছে। লিড স্টোরির শিরোনাম: 'এমন দিনে তারে বলা যায়।' কী বলা যায়, কারে বলা যায় সে সব আর পড়া হয় না, চোখ আটকে যায় কবিতার পাতায়। অনেকগুলো কবিতা ছাপা হয়েছে। নবীন-প্রবীণ

অনেক কবির নাম ছাপা হয়েছে। কবিতা নিয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও কাগজের অফিসে চাকরির সুবাদে অনেক কবির সঙ্গে পরিচয়ও ঘটেছে। কিন্তু সহসা আমার দুচোখ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায় বিশেষ এক কবির নামের উপরে। কবিতার নীচে লেখা কবির নাম– মেঘনীল। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে– এ কোন মেঘনীল? আগে বা পরে কিছুই নেই, শুধু ওই একটি শব্দ। মেঘনীল কবিতা লেখে? কবে থেকে? গান ছেড়ে কি কবিতাচর্চা শুরু করেছে সে? কোথায় আছে কেমন আছে মেঘনীল, খুব জানতে ইচ্ছে করে। সাহিত্য সম্পাদক নাসির ভাইকে ফোন করতেই পেয়ে যাই কবি মেঘনীলের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর। ই-মেইল অ্যাড্রেস দেখে আমার চোখ তো কপালে ওঠার দশা– কবি তাহলে কানাডা প্রবাসী বাঙালি! নাসির ভাই বেশ প্রশংসা করেন তার, বাঙালি নারী লেখকেরা দেশের বাইরে গেলে ফেমিনিজম নিয়ে যে রকম হইহল্লা করে, এই ভদ্রমহিলার মধ্যে সে সব নেই। আছে চিরায়ত বাঙালি নারীর সর্বংসহা এবং সর্বজয়ী কল্যাণী ছবি। আজকের কবিতাই পড়ে দেখ না!

তাই তো! এতক্ষণ কবি-ভাবনাতেই মগ্ন হয়ে আছি। কবিতা তো পড়া হয়নি। অবশ্য কবিতার আমি কী-ইবা বুঝি! আমাদের শিবনারায়ণ স্যার বলতেন, গণিত কিংবা বিজ্ঞান যেমন বুঝে নেবার বিষয়, কবিতা কিন্তু তা নয়। কবিতা হচ্ছে অনুভবের বিষয়। নইলে কালিদাস কি পারতেন মেঘকে দূত করে পাঠাতে! নির্বাসিত যক্ষের বিরহের আর্তি সে তো শুধু অনুভবেরই বিষয়। আমি অনুভূতিকে সজোরসজাগ করে এ কালের কবি মেঘনীলের কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করি। কবি লিখেছেন– 'আমি অনন্ত মেঘ হয়ে ছায়া দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করি হে ক্লান্ত পথিক/ আমি আকাশ ভাঙা বৃষ্টি হয়ে ছুঁয়ে দিই তোমার বুক যে তৃষিত মাঠ/তুমি টের পাও বা না পাও, আমি আছি শস্যদানার অন্তরে– ।'

কবিতা শেষ না হতেই হঠাৎ ভাবনা হয় কে এই মেঘনীল! আমি কি চিনি এই কবিকে? আমাদের সেই নীপাই যদি কবিতা লিখবে তাহলে এই নামে কেন? আমি তো বলেছি এ নাম ভালোবাসার নাম। এ শুধু আমার ব্যবহারের জন্যই আমি রচনা করেছি। কিন্তু এ তুমি কী করেছ মেঘনীল, সবার মধ্যে বিলিয়ে দিলে সেই নাম! কই, আমি তো এতটা উদার হতে পারিনি!

মা এসে নাস্তার তাগাদা দিতেই সম্বিত ফিরে আসে আমার। এতদিন পরে এ সব কী আকাশকুসুম ভাবছি! কবি মেঘনীল নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। বাঙালি বটে, পশ্চিম বাংলার বাঙালিও তো হতে পারে! ওখানে ইন্দ্রনীল, মেঘনীল এ সবই যথেষ্ট সুলভ। নাসির ভাই হয়ত এ কবির নাগরিক পরিচয়ও জানতে পারেন; কিন্তু আমার এতটা কৌতূহলের কী যে ব্যাখ্যা করবেন কে জানে! আমাকে ব্যাচেলর পেয়ে অফিস-কলিগেরাও নেহায়েত কম খোঁচাখুঁচি করে না। নাহ, নাসির ভাইকে আর ফোন করা হয় না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, ফোন যদি করতেই হয় তো সেটা আমার মেঘনীলকেই করব।

সত্যিই ফোন করব? মেঘনীলকেই? নিজেকে পরিহাস করে উঠি, আমার মেঘনীল! কী স্পর্ধিত উচ্চারণ! হ্যাঁ, আমাদের সেই মফস্বল শহরের বৃষ্টিভেজা নীপার মাথায় একদা আমি নতুন নামের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলাম ঠিকই, মেঘনীল আমারই রচিত নাম; কিন্তু এখন যদি ফোনের ওপার থেকে অচেনা নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হয়– দুঃখিত, আমি নীপা নই, মেঘনীল। আপনার বোধ হয় ভুল হচ্ছে কোথাও। ফোনের সুইচ যদি অফ করে দেয়! আহ, আমি ভাবতে পারি না।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে এসেছে। ভারী সংগীতপ্রিয় মানুষ। প্রায়শ উচ্চ শব্দে গান বাজায়। প্রবল বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে তার রেকর্ড প্লেয়ার ছড়িয়ে দেয় অমিয় সুধা: 'বাদলদিনের প্রথম কদমফুল করেছ দান/ আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান...।' এরই মাঝে আমার ভয় করে। নীপাও একবার ভয় পেয়েছিল, বেশ মনে পড়ে। আমারও খুব ভয় হয়। ফোন করার সাহস হয় না। তখনো গানের আভাস ভেসে আসে– 'মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে/ রেখেছি যে ঢেকে তারে...।'

মনে হলো শেষে, আমার মেঘনীল থাক না ঢাকা অন্ধকারে! নীপবনে ঘন পত রাজির আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকুক না হয় আমার প্রথম কদমফুল।

———— ○ ————

এভাবে চলে যাবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের লাশঘরে পড়ে আছে স্বামী মোহাম্মদ ফারুকের নিথর দেহ। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে নগরীর লালখান বাজারের বাসা থেকে হাসপাতালে ছুটে আসেন স্ত্রী সীমা আকতার। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, দুপুরে বাসায় খেতে এসেছিলেন। খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মুরাদপুরের কর্মস্থলে যান তিনি। বলেছিলেন, রাতে ফিরতে দেরি হতে পারে। কিন্তু এভাবে যে চলে যাবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন সন্তানদের কে

দেখবে? মায়ের আহাজারিতে কিছু বুঝতে পারছে না ফারুকের সাত বছর বয়সি কন্যা ফাহিমা। এক স্বজনের কোলে আনমনে খেলছিল সে।

জানা গেছে, গতকাল বিকালে নগরীর মুরাদপুর এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ফার্নিচারের দোকানের কর্মচারী ফারুক (৩২)। বাইরে হট্টগোল দেখে তিনি বের হয়েছিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ তার বুকে গুলি লাগে। ফারুকের এক ছেলে ও এক মেয়ে। ১২ বছর বয়সি ছেলে মোহাম্মদ ফাহিম বাগমনিরাম সিটি করপোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্র। মেয়ে ফাহিমা বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কেজি ওয়ানে অধ্যয়নরত। ফারুকের শ্বশুর মোহাম্মদ দুলাল বলেন, আমার দুই নাতি-নাতনি জানে না তার বাবা আর বেঁচে নেই। অল্প বয়সে তারা বাবা হারালো। এ দায় কে নেবে? দুই অবুঝ শিশুকে কী জবাব দেব? তাদের কে খাওয়াবে? পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিল ফারুক। সে তো আন্দোলনে যায়নি, রাস্তায় হাঁটছিল। এ দেশে কি নিরাপদে রাস্তায় হাঁটাও যাবে না? প্রধানমন্ত্রী কি এ পরিবারের দায়িত্ব নেবেন? এভাবে আর কত পরিবার তাদের অভিভাবক হারাবে?

নিহত ফারুকের সহকর্মী আনিসুর রহমান বলেন, ফারুক ভাই প্রতিদিন দুপুরে বাসায় খেতে চলে যান। আজকেও (গতকাল) গিয়েছিলেন। ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর তিনি চা খেতে যাচ্ছেন বললেন। তিনি যে এভাবে চলে যাবেন ভাবিনি।

[সূত্র: দৈনিক আজাদী, ১৭ই জুলাই ২০২৪]

শেষ থেকে শুরু

আজহার মাহমুদ

তড়িঘড়ি করে রুবেল তৈরি হচ্ছে, ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে। রুবেলের মা অনেক চেঁচামেচি করছে, অল্প ভাত খেয়ে বের হলে কি এমন হয়! রুবেল মায়ের কথায় কান দিচ্ছে না। তার আর একটু লেইট

হলে বাস মিস হবে। রাত ৮টার বাস, চট্টগ্রামের একেখান থেকে সে বাসে উঠবে। মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে বেরিয়ে পড়ল রুবেল।

রুবেলের বাবা নেই, এক বছর হচ্ছে মারা গিয়েছে। পরিবারের সব দায়িত্ব এখন তার। করোনা তার বাবাকে কেড়ে নিয়েছে, পাশাপাশি তাকে দিয়ে গেছে পরিবারের মস্ত বড়ো চাপ। রুবেল ঢাকায় যাচ্ছে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। তার চাকরিটা খুব দরকার। ভালো বেতন আর সুবিধা অনেক। চট্টগ্রামে একটা বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করে, সেই টাকায় কোনো রকম মা আর দুই ভাইবোন নিয়ে চলে যায়। তবে পরিবারের বেশিরভাগ চাহিদা সে পূরণ করতে পারে না। পরিবারের সবাই সেটা বুঝে বলে, খুব বেশি চাহিদাও করে না।

রুবেল একেখান এসে পৌঁছালো। আর ৫ মিনিট লেইট করে এলেই গাড়ি ছেড়ে দিত। এনা বাসের নিয়ম আবার বেশ সুন্দর, সময়মতো তারা গাড়ি ছেড়ে দেয়। যাত্রীকে ১০ মিনিট আগে থেকে কল দেয় কাউন্টার থেকে।

রুবেল অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। দেরি হয়নি, তাহলে ৬৮০ টাকা তার গচ্ছা যেতো। গাড়িতে উঠে অবশ্য সেই স্বস্তি রুবেলের রইল না। কারণ তার পাশের সিটে একজন মহিলা। এমন এক অবস্থায় সে পুরো সময়টা কীভাবে পার করবে সেই চিন্তায় আছে।

৮টায় গাড়ি ছাড়লে রাতের ১টায় ঢাকায় পৌঁছার কথা। তার এক বন্ধুর বাসায় সে উঠবে এবং রাতে থাকবে এই কথাও বলা আছে। সেই বন্ধুটাও আন্তরিক, গাড়িতে উঠার পর থেকেই কতটুকু এসেছে সেই খবর নিতে শুরু করল। রুবেলের অবশ্য বার বার কল করায় বেশ বিরক্ত লাগছে।

তৃতীয়বার কল করার পর বন্ধুকে বলল, আমি পৌঁছালে তোকে কল দিব। আপাতত আর কল দিস না।

এদিকে রুবেলের পাশের মেয়েটিও বেশ অস্বস্তিতে আছে। রাতের বেলায় সে ভেবেছে তার পাশের সিটটা খালি রাখবে। কিন্তু সেখানে একটা পুরুষকে দিলো। দুজনই রোবটের মতো বসে থাকল। প্রায় ঘণ্টা খানিক হলো। এরপর মেয়েটি রুবেলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ঢাকার কোথায় নামবেন?

রুবেল কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, মোহাম্মদপুর। মহিলাটি বেশ চমকে গেল, আর বলে উঠল, আরে আমিও তো সেখানে নামব। আপনি মোহাম্মদপুর কই যাবেন?

রুবেল এবার বেশ বিব্রতবোধ করছে। বলল আমি চিনি না কই যাবো। আমার বন্ধু আমাকে রিসিভ করবে।

মেয়েটি বলল, আমার নাম রূপা। আমি আসলে বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারি না পাশে কেউ থাকলে।

রুবেল হাসির সুরে বলল, আচ্ছা।

এরপর রুবেল কিছুটা ফ্রি হলো রূপার সাথে। রুবেল নিজের পরিচয়টাও দিলো। বলতে বলতে রুবেলের বাড়িতে কে কে আছে সব বলা হয়ে গেছে। রুবেল ঢাকায় যাচ্ছে, বিসিবির একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে সেটাও বলে ফেলল। এদিকে রূপার গল্প শুনার জন্য রুবেল বেশ আগ্রহী।

রূপাকে রুবেল প্রথমে জিজ্ঞেস করল আপনি কই যাচ্ছেন?

রূপা বলল, আমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। বছরের ছয় মাস নিজের বাড়িতে আর ছয় মাস শ্বশুরবাড়িতে থাকি। আপনি একা কেন যাচ্ছেন? দুলাভাই কই?

রূপার মুখ তখন অন্ধকার হয়ে গেল। রূপা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। এত সুন্দর মেয়ে একা চলাফেরা করাটা আসলেই ভালো নয়। রুবেল এই সেন্সে রূপাকে এটা জিজ্ঞেস করল। রূপা বলল, সেসব গল্প করতে গেলে সময় পার হয়ে যাবে।

রুবেলের আগ্রহ ততক্ষণে দ্বিগুণ হয়ে গেল। রুবেল বলল, আপনি বলতে চাইলে আমি শুনতে আগ্রহী। রূপা হঠাৎ করে রুবেলকে বলতে আগ্রহী হয়ে উঠল। রূপার কেন জানি রুবেলের প্রতি বিশ্বাস জন্মাতে লাগল। অথচ তাদের পরিচয় ঘণ্টাখানিকের। এত অল্প সময়েও এত ব্যক্তিগত আলাপ করা যায় সেটা রূপার কথা না শুনলে বুঝা যাবে না।

রূপা বলল, আমার স্বামী নিখোঁজ আজ ৫ বছর হচ্ছে। সবাই মনে করছে মারা গিয়েছে। আর মারা না গেলে এত বছর ধরে নিখোঁজ থাকে কীভাবে। পুলিশ, সিআইডি, র‍্যাব কত সংস্থার কাছে গেলাম। কেউ আমার স্বামীর খোঁজ দিতে পারল না। আমার শ্বশুর একদিন আয়োজন করে গায়েবি জানাজা পড়িয়েছেন, আর মেজবানি খাইয়েছেন। এখন আমি নিজেকে বিধবা মনে করি। এরপর রূপা মিনিট দশেক চুপ থাকার পর রুবেল বলল, আচ্ছা আপনার বাড়ি চট্টগ্রামের কোথায়?

রূপার এমন ঘটনা শুনে রুবেল বিশ্বাস করতেই পারছে না। তাছাড়া রূপাকে দেখে বিবাহিতও মনে হয় না। রূপার প্রশ্নের উত্তরে বলল, সিটিগেট। আপনার?

আমার বাড়ি বাঁশখালী। তবে থাকি লালখান বাজারে। আপনার কথা তো কিছু আর বললেন না।

রূপার মুখে এই কথা শুনে রুবেলও তার ঘরের সবকিছু রূপাকে বলল। রুবেলের বাবা মারা যাওয়ার ঘটনাটা রূপার মনেও দাগ কেটেছে। রূপা অবশ্য এখনও তার বাবা এবং শ্বশুর দুজনেরই আদর পাচ্ছে। প্রায় প্রতিবারই রূপাকে তার বাবা আনা-নেওয়া করে। এবার রূপা ইচ্ছে করেই একা শ্বশুরবাড়ি যেতে চেয়েছে।

গল্প করতে করতে রূপা আর রুবেল একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। বাসের সুপার ভাইজার দুজনকে ডেকে দিলো। রাত প্রায় ২টা, মোহাম্মদপুর চলে এসেছে। রূপা আর রুবেল দুজনেই নামল। রূপা বাস থেকে নেমে তার শ্বশুরকে ফোন দিলো,

রুবেল দিলো তার বন্ধুকে।

দুজন মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে বিদায় নিলো। কেউ কাউকে বলতে পারছে না ফোন নম্বর দিতে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুজনই দুজনকে বেশ পছন্দ করেছে। এদিকে রুবেলের বন্ধু চলে এসেছে। তবে রুবেল বলল আর কিছুক্ষণ পরে যাবে। রূপাকে একা রেখে সে যেতে চাচ্ছে না।

রূপার এই জিনিসটা বেশ ভালো লাগল। রূপার শ্বশুর আসার পর রূপা চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় একটা কার্ড ফেলে গেল। রুবেল সেটি উঠিয়ে দেখল সেখানে লেখা আছে আশরাফ উদ্দিন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। রুবেল চিন্তা করছে এই কার্ড কার? এটিই কি রূপা ফেলে গিয়েছে? ভুল করে ফেলে গেল না তো! রুবেলের ভেতর নানান প্রশ্ন জন্ম নিচ্ছে। আর এই সেনাবাহিনীর লোকটা কে?

এদিকে রুবেলের বন্ধু আশফাক বেশ মজা নিচ্ছে রুবেলকে নিয়ে। কীরে মামা, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসে মেয়ে পটায় ফেললি গাড়িতেই? রুবেল হাসছে বন্ধুর কথায়। তবে রুবেলের রূপাকে ভালো লেগেছে এটা বলা যায়। কিন্তু বিবাহিত রূপাকে তার মা মেনে নিবে কি-না সেটা নিয়ে রুবেলের সন্দেহ। তাছাড়া রূপা কি রুবেলকে পছন্দ করেছে কি না সেটা তো রুবেল জানে না। এমনও হতে পারে, রাতে একা আসছিল তাই রুবেলের সাথে কথা বলে সময় পার করেছে রূপা।

যাহোক, রুবেল পরদিন ইন্টারভিউ দিয়ে আবার চট্টগ্রাম চলে আসল। আশফাক অনেক জোর করেছে একটা দিন দুই বন্ধু ঘুরবে বলে। তবে

রুবেল তার মায়ের কথা বলে চলে এল। চট্টগ্রাম এসে রুবেল দুদিন পার করল। কার্ডের ঐ নম্বরে ফোন দিবে কি-না সেটা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

এভাবে করতে করতে একদিন ফোন দিয়ে বসল সেই লেফটেন্যান্ট কর্নেলের নম্বরে। ফোন দিতেই সাথে সাথে অপর পাশ থেকে রূপার কণ্ঠ। রুবেল এক রাতের জার্নিতেই রূপার কণ্ঠ মুখস্থ করে রেখেছে।

ফোনের অপর পাশ থেকে রূপা বলে উঠল, কী ব্যাপার ভয় পেয়েছিলেন নাকি?

আপনি কেমনে বুঝলেন আমিই ফোন দিয়েছি?

আমার এই নম্বরে আপনি ছাড়া আর কেউ ফোন দিবে না। এটা আমার স্বামীর নম্বর। সে নিখোঁজ হওয়ার দুবছর পর এটা আমি আমার নামে রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছি। এজন্যই ঐদিন আমার স্বামীর কার্ডটা আপনাকে দিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

তো আমাকে নম্বর কেন দিলেন?

কেন দিয়েছি জানি না, তবে মনে হলো দিই, তাই দিলাম। আপনি চাইলে ফোন নাও দিতে পারতেন।

আপনি রেগে যাচ্ছেন মনে হয়।

না, মোটেও আমি রাগছি না।

তাহলে বলুন, কেমন আছেন?

আলহামদুলিল্লাহ। আপনি?

আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো। আপনার শ্বশুরবাড়ির সবাই কেমন আছে?

ভালো। আপনার বাসার সবাই কেমন আছে?

আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর দুজন ফোনের দু-প্রান্তে মিনিট দুয়েক চুপ থাকল। কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না দুজনে। তারপর রূপা বলে উঠল, আচ্ছা আপনার চাকরির কী হলো?

এখনও জানায়নি, সম্ভবত হবে না।

যদি হয়, তাহলে কি জয়েন করবেন?

হ্যাঁ।

পরিবার?

তাদেরও ঢাকায় নিয়ে আসব।

তাহলে আপনার চাকরি হয়ে যাবে।

রূপার এমন কথা শুনে রুবেল হাসি দিলো। বলল, ঠিক আছে পরে কথা হবে আবারও।

পরদিন রুবেলের কাছে বিসিবি থেকে ফোন আসল। তার চাকরি হয়েছে। রুবেল একটু সারপ্রাইজড। সেইসাথে বেজায় খুশিও।

রূপাকে ফোন দিয়ে বিষয়টি জানালো। রূপাও বেশ খুশি। রূপার সাথে কথা বলার পর রুবেল বাসায় গিয়ে সবাইকে বলে। সবাই খুশি। তবে রুবেলের মা চট্টগ্রাম ছেড়ে যেতে চায় না। রুবেল তখন বায়না ধরল, সবাই না গেলে সে চাকরিটা করবে না। রুবেলের মা তখন বাধ্য হয়ে রাজি হলো। ছেলের এত ভালো চাকরি হাতছাড়া করা বোকামি হবে।

রুবেল ইচ্ছে করেই মোহাম্মদপুর বাসা নিলো। এরপর রূপার সাথে নিয়মিত কথাও হচ্ছে। একদিন রূপার সাথে দেখাও করল। এভাবে দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলল। অথচ কেউ কাউকে বলার সাহস পাচ্ছে না। রুবেল ভাবছে, রূপা এটা কীভাবে নিবে। আবার রূপা ভাবছে, সে বিবাহিত হয়েও কীভাবে রুবেলকে এই কথা বলবে। রুবেল যদি সেরকম না ভেবে থাকে তাহলে তাদের বন্ধুত্বটাও নষ্ট হবে।

এভাবে বেশকিছু দিন যাওয়ার পর রুবেল রূপাকে মেসেজ করল একটা। মেসেজ লেখা ছিল, রূপা আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

রূপার কাছে এই মেসেজটা ছিল স্বপ্নের মতো। রূপা অবশ্য কোনো উত্তর দিলো না। এদিকে রুবেল দুদিনেও রূপার উত্তর কিংবা ফোন না পেয়ে বেশ আপসেট হয়ে গেল। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করছে সে। দুদিন পর রূপা ফোন দিলো রুবেলকে। রূপার ফোন পেয়ে রুবেল বেশ নার্ভাস।

রূপা কল দিয়ে বলল, কাল দেখা করো। আমি রমনা পার্কে থাকব। এটা বলেই কেটে দিলো।

রুবেল আরও নার্ভাস। পরদিন রুবেল পার্কে গেল। রূপার দেখা নাই। একটু পারেই রূপা আসল। নীল শাড়ি পরে রূপাকে পরির মতো লাগছে। রুবেল যেন রূপাকে দেখেই হুশ হারিয়ে ফেলেছে।

রূপা রুবেলের কাছাকাছি এসে বলল, দেখো আমি বিবাহিত, আমাকে বিয়ে করতে চাও এটা আমার জন্য বেশ প্রাপ্তির। কিন্তু আমি চাই না তুমি হুটহাট

সিদ্ধান্ত নাও। আবেগের বশে বিয়ে করে পরে আবার কষ্ট পেতে পারো।

রূপার হাত ধরে রুবেল বলে, আমি তোমার শরীরকে নয়, তোমাকে ভালোবাসি। তোমার ভেতরে বাস করা সুন্দর মানুষটাকে ভালোবাসি। তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার পরিবারের সাথে কথা বলতে চাই। আর তোমাকে আমি হুটহাট করে বিয়ে করতে চাইলাম কই? আমাদের পরিচয় ১৮০ দিনের। ঘণ্টার হিসেবে বলতে গেলে ৪৩২০ ঘণ্টা। মিনিটের হিসেবে, দুই লক্ষ উনষাট হাজার ২০০ মিনিট। আর সেকেন্ডের...

রূপা বলে উঠল, থাক থাক বাবা, আর বলতে হবে না।

এভাবে দুজনের খুনসুটিতে সময়টা বেশ ভালো গেল সেদিন। এরপর একদিন রুবেল রূপার পরিবারের সাথে দেখা করে। রুবেলের মাকেও জানায় পুরো বিষয়টা। রুবেল সবচেয়ে অবাক হয়, তারা সহজেই রাজি হয়ে যাওয়াতে। রূপার পরিবারও রাজি। রূপার শ্বশুরবাড়ির লোকজন মন খারাপ করলেও রূপার শ্বশুর চায় রূপার বিয়ে হোক। তাই রুবেল আর রূপার এক হওয়াতে কোনো ঝামেলা নাই।

এর মাঝে দেশে এক ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। দেশে কারফিউ জারি করল সরকার। রূপার সাথে দেখা করতেও এখন বেশ রিস্ক হয়ে যায় রুবেলের। এদিকে দিন যত যায় দেশের পরিস্থিত তত ভয়ংকর হয়।

রুবেল রূপা দুজনই ছাত্রদের পক্ষে। রুবেলকে বিসিবি থেকে নোটিশও পাঠিয়েছে তার ফেসবুকে সরকারের বিপক্ষে লেখালেখি করার কারণে। রুবেল-রূপা মাঝে মাঝে আন্দোলনেও যায়। দিন দিন মানুষ মারা যাচ্ছে। মোহাম্মদপুরের প্রায় সব মিছিলে রুবেল থাকে। এজন্য একদিন রুবেলের চাকরিও চলে যায়। তবে রুবেলের এমন দেশপ্রেম দেখে রূপা বেশ খুশি।

রুবেল আর রূপা সিদ্ধান্ত নেয় তারা এই আন্দোলন সফল হওয়ার পরে বিয়ে করবে। তাদের দুজনেরই মাথায় ছিল না, এই আন্দোলন বিফলে যাবে। এই এক বিষয়ে তাদের এক ধরনের অন্ধবিশ্বাস ছিল। যথারীতি ৫ই আগস্ট দেশের প্রধান পালিয়ে গেল। রুবেল আর রূপা দুপুর দুইটায় সেই খুশিতে মিছিলে জড়ো হলো। সেদিনই প্রথম রূপাকে রুবেল জড়িয়ে ধরেছে। দুজনেই বেশ খুশি।

হাতে হাত রেখে বিজয় মিছিলে তারা এগুচ্ছে। মোহাম্মদপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে তারা মিরপুরের দিকে গেল। তখনই একটা গুলি এসে লাগল রুবেলের কপালে। সাথে সাথেই রুবেল প্রাণ হারায়।

রুবেলের মৃত্যুতে সে জুলাই বিপ্লবের শহিদের মর্যাদা পেলেও রূপা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিটা হলো রুবেলের পরিবারের। রুবেলের বোন এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। কয়েকদিন পর তার রেজাল্ট দিবে। বোনকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারল না রুবেল। সেইসাথে ক্লাস সেভেনে পড়া তার ছোটো ভাইয়ের ভবিষ্যৎও প্রায় অন্ধকার।

যদিও রুবেলের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে নতুন সরকার, সেইসাথে আর্থিক সহায়তাও মিলছে ভালো। তবে ছেলে হারানোর বেদনা কোনোভাবেই কমছে না তার মায়ের।

রূপার কাছে মনে হচ্ছে, সে একটা অপয়া আর অভাগা মানুষ। তার বিয়ের দুমাসে স্বামীকে হারাল। আর নতুন করে রুবেলের সাথে জীবন শুরু করার আগেই নিজের চোখের সামনে ভালোবাসার মানুষের মৃত্যু দেখল। এরচেয়ে কঠিন একজন মানুষের জন্য আর কি হতে পারে!

রুবেলকে বাঁশখালীতে তার পারিবারিক কবরস্থানে কবর দেওয়া হলো। ৬ই আগস্ট যখন রূপা রুবেলের কবরের পাশে বসে কান্না করছে, তখন রূপার কাছে ফোন এল তার শ্বশুরের। তার শ্বশুর জানাল, আশরাফ ফিরে এসেছে। রূপা বিস্মিত হয়ে পড়ল। আশরাফ! কীভাবে এল? রূপার কোনোভাবেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

রূপা ছুটে গেল ঢাকায়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখে তার স্বামী আশরাফ আসলেই এসেছে। রোগা শরীর আর চেহারায় দাগ পড়েছে। আশরাফ এতদিন আয়নাঘরে বন্দি ছিল। আয়নাঘর কী রূপা জুলাই-বিপ্লবের সময় জেনেছে। এর আগে তেমন ধারণা ছিল না তার।

রূপার এই মুহূর্তে কী করা উচিত বুঝছে না, রুবেলের শোকে শোকাহত হওয়া, না-কি হারানো স্বামীকে ফিরে পাওয়ায় আনন্দ করা! রূপা নির্বাক হয়ে রইল। শুধু তার চোখের কোণে সামান্য জল গড়িয়ে পড়ল।

নতুন বাংলাদেশ

আইউব সৈয়দ

রূপ অপরূপের ইতিবৃত্ত নিয়ে জেগে ওঠে বাংলাদেশ
ব্যক্তিত্বের বিন্যাসে বিকশিত ছায়ার সাথে অস্তিত্বের পথে
পূর্ণোদ্যমে গান শোনায়। শ্যামল হাওয়া এসে নির্বাচিত ছন্দে
বাজায় বিপ্লবের মাদল; শর্তহীন বোধে চড়ে বসে রথে।
রাতে তারার জোনাকি স্মৃতিধর গল্পকথা বলে; গৌরবের
যাবতীয় অজেয় সুনাম প্রজ্ঞা প্রতীকের জ্যোৎস্নার শিসে
ডেকে আনে হরিণের মায়া– চতুর্দিকে অস্থিরতা নেই কোনো
শিকড় ছড়ায় জলে স্থলে– নৃত্যের লহরা তোলে ঘ্রাণে মিশে।

চব্বিশের জুলাই যে স্বরূপেই সঞ্চিত করে আনন্দধ্বনি
বনে ও বাদাড়ে বিস্ময়ের ঝাঁকি বিপ্লবের ব্যাকরণে থাকে ,
প্রসার ঘটায় প্রীতির নির্যাস , মুক্তিকামী হয় পদাবলি
জীবন জাগানো মুঞ্জরিত 'ওয়াসিম', লাল মানচিত্র আঁকে।

সমস্ত দর্শন নিরন্তর বহমান– চেষ্টা ও সাধন বেশে,
পৃথিবীর সত্য– স্বীকৃতির কৃষ্টি হাসে নতুনের বাংলাদেশে।

আন্দোলনে চাটগাঁ বিভাগ

আতিক রহমান

জুলাই ছাত্র আন্দোলনে কুমিল্লা ও চাঁদপুরে
বিবাড়িয়া, নোয়াখালি, ফেনী এবং লক্ষ্মীপুরে
আন্দোলনে তীব্র বেশে ছাত্রছাত্রী দাঁড়ায় ঘুরে!

চাটগাঁ বিভাগ থেকে সকল জেলা, থানা–
বিবেকবানের মিছিল আসে ষোলআনা!
ছাত্র-যুবক হয় একাকার,আন্দোলনে বাঁধে দানা!

ঠিক তখনি শোষক হঠাৎ চালায় গুলি
ছাত্র-যুবার গেলো জীবন! কেমনে ভুলি?
একশত পাঁচ হলো শহিদ এই বিভাগে–
এই বিভাগের নেতাও আছেন আন্দোলনের আগেভাগে!

হারিয়েছি শত তাজা প্রাণ

উম্মে সালমা

দেখিনি বাহান্ন, দেখিনি একাত্তর
দেখেছি চব্বিশ সাল,
সাঈদ, শান্ত, মুগ্ধ-এর মতো
হারিয়েছি শত তাজা প্রাণ।

ভালোবেসে দেশটারে
দিয়েছে তারা নিজেদের বলিদান,
রক্তে-মাংসে গড়া শরীরে
গুলিবিদ্ধ হয়েছে তাজা জান।

কত মায়ের বুক
হয়েছে খালি এ জুলাই মাসে,
রঙিন স্বপ্ন বুনে ছিল তারা
সকাল, সন্ধ্যা এবং রাতে।

শত স্বপ্ন হলো ধূলিসাৎ
জুলাই আন্দোলনে,
তা কি কখনো পূর্ণ হবে
তাদের মায়েদের আর্তনাদে!

কষ্টে ভরা মুখে আমরা
শুনি ও বলি বারংবার,
হারিয়েছি, আমরা হারিয়েছি
হারিয়েছি শত তাজা প্রাণ।

এক রক্তাক্ত জুলাই

মমতা মজুমদার

রুগ্ন এই সময়,
রক্তাক্ত আজ বুকের ভাঁজে বোবা যন্ত্রণার মাখামাখি।
রোজ রোজ আঁতকে ওঠে, বিরহে দুমড়ে পড়া
শত শত প্রাণ!
এই বুঝি বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেবে কারো ভাইয়ের বুক।
কারো বোনের শ্বাসপ্রশ্বাস, কিংবা কেড়ে নেবে
কারো বুকের মানিক!
পাখিদের ডানা ভাঙার আক্রোশে উত্তাল সারা শহর, পাড়া, গ্রাম।
অদ্ভুত রক্তের হলি খেলায় মেতে আছে এক রাক্ষসী;
এই কোনো বাহান্নর ভাষা আন্দোলন কিংবা উনিশ
শত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নয়!

ইতিহাসের বর্বর এক স্বৈরাচারী জাতির বিরুদ্ধে
টগবগে ছাত্র-জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলন।
এই এক রক্তাক্ত জুলাই, দুই হাজার চব্বিশ সন।
বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ,
এক সাহসী যুবক, নাম তার আবু সাঈদ!
পরপর গুলিবিদ্ধ হরিণের মতো ছটফট করেছে বেশকিছু তরুণ প্রাণ।
আহত তারুণ্যের শক্তি আজও যন্ত্রণায় গড়াগড়ি
করছে শয্যাশায়ী হয়ে!
আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে
দমিয়ে রাখতে পারেনি কেউ;
বাংলার তরুণরা বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলো খ্যাপা
বাঘের ন্যায়।
দুর্বার বেগে এগিয়ে চলার মনস্থির করে,
বুক পেতে দিয়েছে মরণাপন্ন ওই বুলেটের মাঝে।
এতটুকু পিছুপা হয়নি প্রিয় ছাত্র-জনতা।

আমরা তরুণ

সুলতানা রাসু

আমরা তরুণ দেশের জন্য
রক্ত দিতে পারি
মুক্ষের মতো বলতে পারি
পানি লাগবে পানি?

আমরা তরুণ দেশের জন্য
জীবন দিতে রাজি
ওয়াসিমের মতো জীবন নিয়ে
ধরতে পারি বাজি।

আমরা তরুণ দেশটাকে
মায়ের মতো মানি
আবু সাঈদের মতো মোরা
বুক পেতে দিতে জানি।

রুখে দেবো

কবির কাঞ্চন

জুলাই-আগস্ট লাল হলো তাই
আম জনতা ক্ষুব্ধ
রক্ত দিলো আবু সাঈদ
রক্ত দিলো মুগ্ধ।

একাত্তরের চেতনা কী
জাগলো ওদের বুকে
'দেশ বাঁচাতে জীবন দেবো'
সবার মুখে মুখে।

স্বাধীন দেশে বর্গি ঠেকাও
চরম প্রতিশোধে
স্বৈরাচারীর হয়নি উদয়
একটুখানি বোধ-এ।

দামাল ছেলে ছুটলো সেদিন
ঢাকা অভিমুখে
ভয়কে ওরা জয় করেছে
শত বাধা রুখে।

এই খবরটা ছড়িয়ে গেলে
সারাদেশের মাঝে
স্বৈরাচারের বুকের ভেতর
বিদায় ঘণ্টা বাজে।

সুযোগ বুঝে পালায় ওরা
যে যার মতো করে
গাঢাকা দেয় কেউবা আবার
রয় না পড়ে ঘরে।

আবার কোনো স্বৈরাচারে
দম্ভ যদি করে
সবাই মিলে রুখে দেবো
একটা একটা ধরে।

আমার জন্য অপেক্ষা করো না

মুহিবুল হাসান রাফি

আমার জন্য অপেক্ষা করো না, প্রেয়সী
আমি কিনে নিয়েছি জীবনের তরে সত্যকে।

অজস্রের চেয়ে অধিক অচেনা হাতযুগল
কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছে
নির্ভীক, নির্ভয়
মুক্তির প্রান্তরে।

কল্পনায় যত করতে চেয়েছি তোমায় স্মরণ
ততবার টিয়ারগ্যাস বন্ধ করে দিয়েছে আমার চক্ষুদ্বয়।

অপেক্ষিত থেকো না আর আমার জন্য
আগামীকে বলে দিও
তোমার প্রেমিকের কথা
যে কি-না তোমায় রেখে মুক্তির প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিল।

উঠুক জোয়ার বুকে

নাজমুল সায়েম

উঠুক জোয়ার আবার বুকে,
জোয়ার আসুক ঠোঁটে,
আসুক নেমে আবার বন্যা
দিতে জালিম রুখে।

অত্যাচারিত বাঙালি তারা
যুদ্ধ করতে জানে,
আদায় করতে জানে তারা
অধিকারের মানে।

কলমরা কথা বলুক
কাগজেও হোক প্রতিবাদ
আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠুক
বীর বাঙালির বুকের আঘাত।

চলে গেলেন গবেষক মুস্তাফা জামান আব্বাসী

শিরিনা আক্তার

মুস্তাফা জামান আব্বাসী ছিলেন একজন বাংলাদেশি সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত বিষয়ক অধ্যাপক ও গবেষক। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত হন। তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির 'কাজী নজরুল ইসলাম এবং আব্বাসউদ্দীন আহমদ গবেষণা ও শিক্ষা কেন্দ্র' -এর গবেষক ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে তার কাজের জন্য তিনি ২০১৩ সালে নজরুল মেলায় আজীবন সম্মাননা লাভ করেন। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন আব্বাসী । ১০ই মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

আব্বাসী ১৯৩৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান ভারত) পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোক সংগীতশিল্পী ও সুরকার আব্বাসউদ্দীন আহমদের তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর বড়ো ভাই মোস্তফা কামাল ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। তাঁর বোন ফেরদৌসী রহমান একজন সুরকার ও সংগীতশিল্পী। আব্বাসী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু এবং ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁর নিকট সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন। মুস্তাফা জামান আব্বাসী আসমা আব্বাসীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আসমা একজন শিক্ষাবিদ ও লেখিকা। তাদের দুই কন্যা– সামিরা আব্বাসী এবং শারমিনী আব্বাসী। সামিরা লোকসংগীত, নজরুল সংগীত ও আধুনিক গানের চর্চা ও গবেষণা করছেন।

আব্বাসী মোট ৫০টি বই প্রকাশ করেন। তিনি ভাওয়াইয়া গানের উপর দুটি বই প্রকাশ করেন যার মধ্যে ১২০০ গানের উল্লেখ রয়েছে। তিনি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি, নিফফারি এবং সুলতান বহুর কবিতা নিয়ে কয়েকটি বই প্রকাশ করেছেন। তার অন্যান্য কয়েকটি বই হলো– আব্বাসউদ্দীন আহমদ, মানুষ ও শিল্পী, কাজী নজরুল ইসলাম, ম্যান অ্যান্ড পোয়েট, পুড়িব একাকী এবং বাংলা ও ইংরেজিতে নজরুল এবং আব্বাসউদ্দিন স্মৃতিময় অ্যালবাম সাগা অব টাইম। তিনি আমার ঠিকানা এবং ভরা নদীর বাঁকে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেছেন। অনুষ্ঠান দুটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হতো।

মুস্তাফা জামান আব্বাসী রচিত গ্রন্থের তালিকা নীচে দেওয়া হলো : *প্রাণের গীত*, *জীবন নদীর উজানে*, *অব মিউজিক্যালস অ্যান্ড মুভ্যান্স*, *ভাটির দ্যাশের ভাটিয়ালি*, *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি-২*, *বাকি জীবনের কথা*, *সুরের কুমার: শচীন দেববর্মণ*, *নতুন আলো ভরাও প্রাণে*, *আব্বাসউদ্দিন মানুষ ও শিল্পী*, *স্পষ্ট জ্যোতি আল কুরআন*, *রাসুল (সা.)-এর পদপ্রান্তে*, *জলসা থেকে জলসায়*, *ইমামের শুভদৃষ্টি*, *গোধূলীর ছায়াপথে*, *আমার মায়ের মুখ*, *আব্বাসউদ্দিনের গান*, *ভালোবাসি আজও কালও*, *হরিণাক্ষী*, *লালন যাত্রীর পশরা*, *দ্য নেম অব মুহাম্মদ*, *লঘু সংগীতের গোড়ার কথা*, *ফিফটি ইয়ার্স অব একুশের ফেব্রুয়ারি*, *গালিবের হৃদয় ছুঁয়ে*, *যে নামেই ডাকি*, *রবীন্দ্রনাথ প্রেমের গান*, *স্বপ্নেরা থাকে স্বপ্নের ওধারে*, *মুহাম্মদের নাম*, *কালজানির ঢেউ*, *অচেনা চীন চেনা আমেরিকা*, *রুমির অলৌকিক বাগান*, *বাণী: মুহাম্মাদ (সা.)*, *সুফি কবিতা*, *জাপান: সূর্য উঠেছে যেখানে*।

সংগীতে অবদানের জন্য মুস্তাফা জামান আব্বাসী নানান পুরস্কার অর্জন করেছেন। সেগুলো হলো– একুশে পদক, ১৯৯৫; চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার, ২০১১; চ্যানেল আই নজরুল মেলা আজীবন সম্মাননা, ২০১৩; এপেক্স ফাউন্ডেশন পুরস্কার; নাট্যসভা পুরস্কার; বাংলা শতবর্ষ পুরস্কার; আব্বাসউদ্দীন স্বর্ণ পদক; মানিক মিয়া পুরস্কার; সিলেট সঙ্গীত পুরস্কার; লালন পরিষদ পুরস্কার এবং বাংলা একাডেমী ফেলোশিপ। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন শোক প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

চলো আজ ফিরে যাই গোধূলির ওপারে
বেলা বোস
2441139
By Eva

রক্তাক্ত জুলাই
আমার ভাইয়ের রক্ত
বৃথা যেতে দেব না.

২০২৪ এর যোদ্ধা
মেধা শহীদ
Every soul shall taste of Death
Freedom
Justice
VPN
ft.
SINTIA
PANNA
ALIFA
SUMAIYA
SUSHANTO

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 12, June 2025, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd